কিন্নরী

প্রফুল্ল রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭১

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীচিত্তরঞ্জন নাগ

পরমবন্ধুবরেষু

কিন্নরী

আরা জেলার এই গঞ্জটাকে বিহারের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধনমানিকপুর পাটনা না, মজঃফরপুর না, পূর্ণিয়াও না। ইদানীং বারাউনীতে সিন্ধ্রিতে ধানবাদে নানারকম কলকারখানা ঘিরে যে সব আধুনিক জমকালো শহর জন্ম নিয়েছে তাদের তালিকাতেও ধনমানিকপুরের নাম নেই।

এ জায়গাটার ঐতিহাসিক গৌরব নেই। পাণিপথ অথবা হলদিঘাটের যুদ্ধের মত স্মরণীয় কোন ঘটনাই এখানে ঘটে নি। কোন দিগ্বিজয়ীর পদভারে এখানকার মাটি কাঁপে নি; তার অশ্বক্ষুরের আঘাতে এখানকার ধুলো বিক্ষুব্ধ হয় নি। ধনমানিকপুরের বাতাসে কান পাতলে সুদূর অতীত থেকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা অথবা যুদ্ধের বাজনার কোন আওয়াজই শুনতে পাওয়া যাবে না।

এ জায়গাটার অতীত নেই। বারাউনী অথবা সিন্ধ্রির মত একটা প্রবল ভবিষ্যৎ তার থাকতে পারত; ধনমানিকপুরের তাও নেই। ধনমানিকপুরের যা আছে তা হল ক্ষীণ স্রোতের মত অতি দুর্বল একটি বর্তমান।

চারদিকে ছড়ানো ইতস্তত কিছু হাটের চালা; দিনের বেলা ওগুলোর তলায় দোকান বসে। রাত্তিরে এ অঞ্চলের তাবত অনাথ নিরাশ্রয় কুকুর তাদের দখল নেয়। একধারে ধান-চাল-গম-বাজরার সারি সারি আড়ত। প্রায় সারা বছর ওগুলো তালাবন্ধ থাকে। একবার চৈত্রে, আরেকবার অঘ্রানে তালাগুলো খোলা হয়; তখন ফসল ওঠার মরসুম যে।

আরেক ধারে ছোট লাইনের একটা স্টেশন। সারাদিনে দুটো আপ আর দুটো ডাউন মোট চারটে ট্রেন এখানে থামে। দু আড়াই শ'র মত দেহাতী যাত্রী ওঠানামা করে। যারা ট্রেনে ওঠে তারা আসে দূরে গ্রামগুলো থেকে। যারা নামে তারাও ঐ

গ্রামগুলোতেই যায়।

ধনমানিকপুরের সংক্ষিপ্ত পরিধি ছাড়ালেই মাঠ—তেপান্তরের মাঠ। তারপর উত্তর দিকে সোজা তাকালে নীলাভ ধূমল রেখা। ওটা নাকি পাহাড়; কি পাহাড় কে জানে।

বছর দুই আগে অন্ধ বাপের হাত ধরে ভাসতে ভাসতে এই ধনমানিকপুরে এসেছিল ছিবলি। তার গলায় কালো দড়িতে বাঁধা ছিল একটা সস্তাদামের বেলোছেঁড়া হারমোনিয়াম; বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় সেটা ঝুলছিল। বাপের কাঁধে ছিল টিনের রংচটা একটা সুটকেস আর ময়লা বিছানা।

এসেই গঞ্জের পাশে একটা বড় পিপুল গাছের ছায়ায় বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরেছিল ছিবলি: 'বিলাখি বিলাখি রোয়ে রামসীয়া জানকিয়া—'

সেদিন ছিবলির বয়েস ছিল কৈশোর আর যৌবনের মাঝখানে থমকানো। খঞ্জন পাখির মত তার চোখ দুটি ছিল ঘন পালকে-ঘেরা; তাতে ছিল দীঘল টান। সরু চিবুক; উদ্দাম চুলের রাশি চওড়া বেণীতে আটকানো। ছোট্ট কপালে ছিল সবুজ কাঁচপোকার টিপ। দীর্ঘ সুগোল গলা সারসীর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। গায়ের রঙে ছিল কচিপাতার সজীব শ্যামল মসৃণতা।

তখনও ছিবলির শরীর সম্পূর্ণ ভরে ওঠে নি। আধেক-ফোটা ভুঁইচাঁপার মত মনে হয়েছিল তাকে। কিংবা বলা যায় জোয়ার যেন তার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিল; একটু আস্কারা পেলেই সব অপূর্ণতা ভরিয়ে দিয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

রূপের টান কতখানি, বলা যায় না। তবে এটুকু অনায়াসেই বলা যায় গলার স্বর তার আশ্চর্য মোহময়; তাতে পরিপূর্ণ মদের পাত্রের মত কিছু একটা যেন টলমল করছিল।

সেদিন রামচরিতের একটি পদই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছিল ছিবলি। মুহূর্তে সমস্ত গঞ্জটা সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ছিবলির

রূপের টানে অথবা সুরের যাদুতে, কে জানে কিসের আকর্ষণে বেশ বড় গোছের একটা ভিড় জমে গিয়েছিল চারপাশে। হাটের চালায় বসে যে দোকানদারেরা ঢুলছিল চমক লেগে তাদের ঢুলুনি ছুটে গিয়েছিল। চোখ রগড়ে কান খাড়া করে তারা সামনের দিকে তাকিয়েছিল। স্টেশন থেকে কুলী আর পয়েন্টসম্যানরা ছুটে এসেছিল। এমন কি স্টেশনমাস্টার নওলকিশোরবাবু পর্যন্ত তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে গান শুনেছিলেন।

গান শেষ হলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল।

'আচ্ছা গানা।'

'বাহ্, বহুত আচ্ছা—'

'কেয়া গাওল ছোকড়ি—'

একটি দুটি করে পয়সা দিয়ে একে একে সবাই চলে গিয়েছিল। এমন কি স্বয়ং স্টেশনমাস্টার পর্যন্ত একটা কুলীকে দিয়ে এক আনা পয়সা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পয়সা গুনতে গুনতে ছিবলি লক্ষ্য করেছিল সবাই চলে গেছে; শুধু একজন বাদ। লোকটা বাজে পোড়া তালগাছের মত ঢ্যাঙা; গায়ের রঙ কবেই জ্বলে গেছে। হাত-পা ফাটা ফাটা। মাথার চুল গোঁ ভরে খাড়া হয়ে আছে; তেলে-জলে তাদের কোনদিন যে নোয়ানো যাবে এমন ভরসা নেই। লোকটার দিক থেকে তেমন চেষ্টা আছে বলেও মনে হয় নি। বয়স তার পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যেই।

থাকার ভেতর লোকটার আছে শুধু একজোড়া বড় বড় চোখ। সে চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে আচ্ছন্নের মত ছিবলির দিকে তাকিয়েছিল সে। খুব সম্ভব গানের রেশটা তখন রিনঠিন করে তার প্রাণে বেজে যাচ্ছিল।

অমন করে তাকিয়ে কেন? অমন করে কেউ তাকায়? প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করেছিল ছিবলি; তার কিশোরী প্রাণে বুঝি দোলা

লেগেছিল কিংবা বিদ্যুৎ চমকের মত তীব্র রেখায় কিছু আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

পয়সা গুনে একটা ঝুলিতে পুরে বাপের হাতে দিয়েছিল ছিবলি।

বাপ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কত ?'

'আট আনা আওর দো পাইসা।'

'ইত্না!'

বাপের চোখেমুখে বিস্ময়-মেশানো খুশি ছলকে উঠেছিল। তা অকারণে নয়। এর আগে গান গেয়ে একসঙ্গে সাড়ে আট আনা কোনদিন পায় নি ছিবলি।

ছিবলি বলেছিল, 'হাঁ।'

বাপ বলেছিল, 'জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে।'

ছিবলির বাপের কাছে যেখানে রোজগার বেশি সে জায়গাই ভাল। পয়সার সঙ্গেই তার ভালোমন্দের বিচার মেশানো।

ছিবলি বলেছিল, 'হাঁ।'

বাপ ধনপতের চোখদুটি সাদা পর্দা দিয়ে ঢাকা; সেখানে সবই অন্ধকার। জগতের আলো চিরদিনের মত তার নিভে গেছে।

ধনপত জন্মান্ধ নয়। একদিন চোখ মেললে লতা-পাতা-ফুল-পাখি-আকাশ এবং নদীতে ভরা দৃশ্যরূপময় পৃথিবী সে দেখতে পেত। যৌবনের প্রান্তে পৌঁছে কি যে হল, ধীরে ধীরে পৃথিবীর আলো ক্ষীণ হতে হতে এক ফুঁয়ে নিভে গেল।

যাই হোক দৃষ্টিটা একবার আকাশের দিকে তুলেছিল ধনপত; কিছু দেখতে নয়—নিতান্তই অভ্যাসবশে। রোদের উত্তাপ অথবা বাতাসের শীতলতা দিয়ে সে দিন কিংবা রাত, সকাল-বিকেল, শীত-গ্রীষ্ম বুঝতে পারে। ঋতুবদল টের পায়। একটা ইন্দ্রিয় হারিয়ে বাকিগুলো তার অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ধনপত বলেছিল, 'এখন দুপুর, না ?'

তার ধারণা নির্ভুল। ছিবলি বলেছিল, 'হাঁ।'

'ধূপের (রোদের) তাপ খুব জোর।'

'হাঁ।'

'বড় ভুখ্ লেগেছে রে—'

'আমারও।'

'আশেপাশে কোথাও ছায়া-টায়া আছে ?'

'আছে। অনেকগুলো হাটের চালা খালি পড়ে রয়েছে।'

'ভালই হল। চল্, তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিবি—'

বাপের হাত ধরে হাটের শূন্য চালাগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ছিবলি। যেতে যেতে একবার পেছন ফিরেছিল। আশ্চর্য, সেই লোকটা তখনও সেইখানে, পিপুলগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। তার একজোড়া বড় বড়, অবাক-বিস্ময়ে-ভরা আচ্ছন্ন চোখ ছিবলির পিছু পিছু সম্মোহিতের মত ছুটে চলেছে।

॥ দুই ॥

দু বছর আগে সেই যে ছিবলি ধনমানিকপুর এসেছিল তারপর থেকে এখানেই আছে। ধনমানিকপুর আসার আগে অন্ধ বাপের হাত ধরে সমস্ত আর্যাবর্ত চষে বেড়াত সে। কোথায় হিমালয়ের কোলে কোলে নগণ্য সব কৃষাণগ্রাম, কোথায় দক্ষিণ বিহার, আর কোথায়ই বা উত্তর প্রদেশ! বলা যায় জীবনধারণ নামে একটা নিষ্ঠুর ব্যাধ তাদের অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরত। কিন্তু কোথাও নিতান্ত প্রাণে বেঁচে থাকার মত ব্যবস্থাটুকু তারা করে উঠতে পারে নি।

গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করাই ছিবলির জীবিকা। ধনমানিকপুরে আসার আগেও বাজারে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে হারমোনিয়ামখানা বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইত সে; লোককে সন্তুষ্ট করতে চাইত কিন্তু বদলে যা পেত তাতে দু-জনের পেট ভরত না।

নিশ্চিন্ত হয়ে পা পেতে বসতে পারে এমন জায়গা ত্রিভুবনে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। স্রোতের কুটোর মত আজ এখানে কাল ওখানে—এই করেই তারা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

ধনমানিকপুরে আসার পর ছিবলিদের দুর্ভাবনা কিন্তু অনেকখানি কেটে গেছে। এই জায়গাটার ওপর তারা নির্ভর করতে পারছে। এখানে রোজ যে হাট বসে তাতে আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে হাজারখানেকের মত লোক আসে। তা ছাড়া দুশো আড়াইশোর মত ট্রেনযাত্রী তো আছেই। বেচাকেনায়, মানুষজনের আনাগোনায় আরা জেলার এই গঞ্জটা মোটামুটি জমজমাট। কিন্তু ছিবলির কাছে এসব খবর উল্লেখযোগ্য নয়।

যে কথাটা সব চাইতে চিত্তাকর্ষক তা এইরকম। ধনমানিকপুরের মানুষের হৃদয় দরিদ্র নয়; হাতের মুঠি তাদের দরাজ। দু-চারদিন পর ছিবলির ঝুলিতে দুটো একটা করে পয়সা ছুঁড়ে দিতে কেউ কুণ্ঠিত হয় না।

তা ছাড়া প্রতি বছর অঘ্রান থেকে মাঘ এই তিনটে মাস আর চৈত্র-বৈশাখ এই দুটো মাস মোট পাঁচ মাস ফসলের মরসুম। অঘ্রান থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত ধান-চাল-গম-বাজরার মরসুম; চৈত্র-বৈশাখ রবিশস্যের। এ সময় ধনমানিকপুরের ধমনী অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সারি সারি তালাবন্ধ গুদামগুলির দরজা খুলে যায়। শুধু কি আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে, সমস্ত আরা জেলা, আরা জেলাই বা কেন, সারন-চাম্পারন-সাহাবাদ—মজঃপুর—বলা যায়, সারা বিহার থেকেই তখন ফড়ে-পাইকের-খুচরো দোকানদারেরা আসতে থাকে। দৈনিক হাজার বারো শো লোকের সংখ্যাটা লাফ দিয়ে দশ বারো হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ছাড়া সারাদিন ধুলো উড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বয়েল গাড়ি দূরদূরান্ত থেকে অবিরাম আসতেই থাকে। যে গাড়ি ধান-গমে বোঝাই হয়ে আসে তা ধনমানিকপুরে ফসল নামিয়ে যায় আর যেটা ফাঁকা আসে সেটা বোঝাই হয়ে কোথায়

কোথায় চলে যায়।

বছরে একবার তিন মাস আরেকবার দু মাস, মোট পাঁচ মাস ফসলের মরসুম। এই পাঁচটা মাস ছিবলিদের পক্ষে সুসময়। এ সময়টা তাদের আয় বেড়ে গিয়ে বিশ পঁচিশ গুণে দাঁড়ায়। পাঁচ মাসে তাদের যা রোজগার, খরচটরচ বাদ দিয়ে তা থেকে বেশ মোটা একটা অংশ তারা জমাতে পারে।

এতকাল তারা যা রোজগার করেছে শুধু জীবন ধারণের জন্য তা খরচ হয়ে গেছে। সঞ্চয়ের চিন্তা তাদের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। ধনমানিকপুর তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, দুর্ভাবনা দূর করেছে। কাজেই এখান থেকে অন্য কোথাও যাবার কথা আজকাল আর ভাবতেই পারে না ছিবলিরা। প্রথম দিন যে ঝাঁকড়া-মাথা পিপুল গাছটার তলায় বসে সে গেয়েছিল সেখানে বসেই সকাল-বিকেল গান গায় ছিবলি, অন্ধ বাপ পাশে বসে থাকে। গঞ্জের প্রান্তে সারিবদ্ধ যে আড়তগুলো রয়েছে তার গা ঘেঁষে একখানা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছে; সেখানে তাদের রাত কাটে।

ধনমানিকপুর গঞ্জটাকে আরো একটা কারণে ভাল লেগেছে ছিবলির। এখানকার মানুষ দরাজ হাতেই শুধু তার ঝুলিতে পয়সা ছোঁড়ে না, অকুণ্ঠভাবে স্নেহও করে। অবশ্য ছিবলির যা রূপ যা বয়েস তাতে যেখানেই যাক বেহিসেবীর মত পয়সা ছোঁড়ার লোকের অভাব হবে না; তাকে স্নেহ করতেও ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ছুটে আসবে। কিন্তু সে পয়সা আর সে স্নেহের তলায় এমন কিছু মলিনতা মেশানো থাকবে যা ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দেবে।

ধনমানিকপুরের মানুষদের পয়সা ছোঁড়ার পেছনে অভিসন্ধি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের স্নেহ অকুণ্ঠ ঝরনাধারার মত; তার ভেতর অন্য কোন খাদ মেশানো নেই। মানুষ যেভাবে ফুলকে স্নেহ করে পাখিকে স্নেহ করে ঠিক সেইভাবেই ধনমানিকপুরের লোকেরা ছিবলিকে স্নেহ করে। সে স্নেহের তলা থেকে এই দু-বছরে

কোনদিনই কোন অসঙ্গত ইঙ্গিত উঁকি দেয় নি। অপার মমতা দিয়ে ধনমানিকপুর ছিবলিকে ঢেকে রেখেছে।

ধনমানিকপুরের যে মানুষটির স্নেহ ছিবলি সব চাইতে বেশি অনুভব করতে পারে তিনি নওলকিশোরবাবু—এখানকার যিনি স্টেশনমাস্টার।

প্রথম দিন প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিবলির গান শুনেছিলেন নওলকিশোরবাবু; শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে পিপুল গাছের তলায় বসে যখনই ছিবলি গান ধরত তখনই স্টেশনমাস্টারের জন্য নির্দিষ্ট কামরাটি থেকে বেরিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তটিতে দাঁড়াতেন।

প্রথম প্রথম দূরে দাঁড়িয়েই শুনতেন নওলকিশোরবাবু। গান শেষ হলে একটা কুলীকে দিয়ে এক আনা করে পয়সা পাঠিয়ে দিতেন। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিয়মিত এবং দৈনন্দিন। মাস দুই তিন এইভাবে কেটেছিল। তারপর কবে যেন একদিন প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পায়ে পায়ে সোজা ছিবলির কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

নওলকিশোরবাবুর বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে। এত বয়েসেও মাথার চুল বেশির ভাগই কাঁচা; ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী তার। গায়ের রঙ মাজা কালো; কপালে একটি ভাঁজও পড়ে নি। গায়ের ত্বক নিরেখ, মসৃণ। দুটি দাঁত নকল; সোনাবাঁধানো। অটুট মজবুত স্বাস্থ্য। কয়েকটি চুলের রঙ বদল এবং মাড়ি থেকে দুটো মাত্র দাঁত খসিয়ে দেওয়া ছাড়া দীর্ঘ পঞ্চাশটা বছর তাঁর সর্বাঙ্গে আর কোন স্থায়ী ছাপই রাখতে পারে নি।

পরনে খাটো ধুতি, যেটার ঝুল হাঁটুর খানিক নীচে এসে থেমে আছে আর রেলের বোতামহীন কোট। কোটটার আদি রঙ একদা কালোই ছিল; কালে আর জলে সেটা ধূসর হয়ে গেছে।

যাই হোক নওলকিশোরবাবু যখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন ছিবলি গাইছিল;

'নয়না মারকে মাত যাও মাত যাও পিয়ারী,
দিল তোড়কে মাত যাও মাত যাও পিয়ারী।'

নওলকিশোরবাবুকে দেখে গানের মাঝখানেই হঠাৎ থমকে গিয়েছিল ছিবলি। পাশ থেকে অন্ধ বাপ জিজ্ঞেস করেছিল, 'গানা থামালি যে ছিবলিয়া!'

চোখে তো দেখতে পায় না ধনপত। গাইতে গাইতে হঠাৎ ছিবলির থেমে যাবার ভেতর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; গভীর কারণ। তাই চকিত হয়ে উঠেছিল ধনপত।

নওলকিশোরকে ছিবলি চিনত। প্ল্যাটফর্মের দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি যে গান শোনেন তা সে লক্ষ্য করেছে। তা ছাড়া রেলের যে কুলীটা রোজ এক আনা করে পয়সা দিয়ে যায় সে যে নওল-কিশোরেরই দূত, প্রথম প্রথম না হলেও পরে তা টের পেয়েছে ছিবলি। বাপের প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল, 'বাবুজী এসেছে যে।'

'কে বাবুজী?'

ছিবলি কিছু বলার আগেই নওলকিশোর বলে উঠেছিলেন, 'আমি নওলকিশোর—'

দুই হাত জোড় করে ধনপত বলেছিল, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না বাবুজী।'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কিছু মনে করব না, আপনি জিজ্ঞেস করুন।'

কুণ্ঠিত মুখে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'তুমি তো চোখে দেখতে পাও না?'

'জী, না।'

'দেখলে চিনতে পারতে, আমি এখানকারই লোক।'

'লেকেন বাবুজী—'

'বল।'

'চোখে আমি দেখতে পাই না ঠিকই তবে গলার আওয়াজ শুনে মানুষ চিনতে পারি। একবার যার গলা শুনি তাকে সারা জিন্দগীতে আর ভুলি না। ধনমানিকপুরের কত লোককে যে গলা শুনে চিনে রেখেছি তার ঠিক নেই। লেকেন আপনার গলা আগে আর শুনি নি।'

নওলকিশোর হেসেছিলেন, 'শুনবে কোত্থেকে? আমি তো আগে আর কখনও তোমাদের কাছে এসে কথা বলি নি।'

ধনপতের হাত জোড়াই ছিল। বিনীত সুরে সে বলেছিল, 'তখন বললেন আপনি এখানকারই লোক—'

'হাঁ—'

'কসুর না নিলে আপনার পরিচয়টা জানতে ইচ্ছে করছে।'

নওলকিশোরই বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ছিবলি বলে উঠেছিল, 'বাবুজী এখানকার টিশনমাস্টার। উই যে ঝিক ঝিক গাড়ি চলে—' ছিবলির ভেতর কিশোরীসুলভ সরলতা আর চাপল্য ছিল। 'ঝিক ঝিক গাড়ি' দিয়ে রেলের পরিচয় বুঝিয়ে দিয়েছিল সে।

এবার আভূমি ঝুঁকে ধনপত বলেছিল, 'রাম রাম বাবুজী, নমস্তে।'

নওলকিশোর প্রতি-নমস্কার জানিয়েছিল, 'রাম রাম, নমস্তে—'

চাষাভুষো জাতীয় দেহাতী মানুষের দয়ার দানে যাদের জীবন নির্ভর তাদের কাছে স্টেশনমাস্টার একজন মস্ত লোক। সেই স্টেশনমাস্টার তাদের কাছে এসেছেন; ধনপত একেবারে বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'আমাদের কি সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন! কোথায় যে আপনাকে বসাই—'

নওলকিশোর বিব্রত বোধ করেছিলেন, 'আরে ছি ছি, সৌভাগ্যের কথা কি বলছ। আমি বসব না; তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

ধনপতের ব্যস্ততা কমেছিল। সবিনয়ে সে জানতে চেয়েছিল, নওলকিশোরবাবুর এত অনুগ্রহ কেন? কেন তিনি এসেছেন

জানতে পারলে ধনপতরা ধন্য হয়।

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'সৌভাগ্যের কথা বলছিলে না?'

'জী।'

'সৌভাগ্যটা আমার।'

অন্ধ চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল ধনপত, 'আপনার কথাটা কিন্তু বুঝতে পারলাম না বাবুজী—'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'তোমার মেয়ের—মেয়ে তো?'

'জী, হাঁ। ওঁর নাম ছিবলি।'

'ছিবলির গান শোনা সৌভাগ্যের ব্যাপার। পঞ্চাশ বছর বয়েস হল। এমন গানা আগে আর কখনও শুনি নি।'

ধনপত বলেছিল, 'আপনাদের কিরপা বাবুজী।'

এবার নওলকিশোর ছিবলির দিকে ফিরেছিলেন, 'এই লড়কিয়া—'

ছিবলি সাড়া দিয়েছিল, 'জী—'

'বেশ তো গাইছিলি। আমায় দেখে থেমে গেলি কেন? নে, আবার শুরু কর—'

চোখ নামিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল ছিবলি।

সস্নেহে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'কি রে মাথা নাড়ছিস যে?'

'ও গানা আমি গাইতে পারব না বাবুজী।' ফিসফিসিয়ে জানিয়েছিল ছিবলি।

গানের পদগুলো মনে পড়েছিল নওলকিশোরের—চপল প্রেমের গান। কিছুটা কৌতুকের সুরেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন রে?'

'সরম লাগে।'

'লেকেন—'

'কী?'

'তোর বাপের সামনে বসে যে গাইছিলি?'

এবার হকচকিয়ে গিয়েছিল ছিবলি। তাই তো, বাপের সামনে বসে এ কি গান গাইছিল সে ! পরক্ষণেই তার নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। খুব ছেলেবেলায়, তখনও তাকে ঘিরে অজ্ঞানের অন্ধকার, মা মারা গিয়েছিল। স্মৃতির ভেতর কোথাও মায়ের ছবি নেই। মায়ের চোখ কেমন, নাক কেমন, গায়ের রঙ, গলার স্বর কিংবা হাতের আঙুল কেমন—কিছুই মনে করতে পারে না ছিবলি। তার স্মৃতি থেকে, অনুভূতি থেকে, ভাবনা থেকে মা চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।

মায়ের স্নেহ কি বস্তু ছিবলি বুঝতে পারে না। সে সম্বন্ধে তার নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা নেই। লোকের মুখে শুনে, তাতে মনের সবটুকু মাধুর্য মিশিয়ে খানিক কল্পনা করে নিয়েছে। মায়ের মমতা তার কাছে প্রত্যক্ষ কোন ব্যাপার নয়, নিতান্তই আপনসৃষ্ট ধারণামাত্র।

মা নেই কিন্তু বাপ আছে। দুই বিশাল ডানা মেলে মা-সারস যেভাবে তার শিশুকে ঝড়-বৃষ্টি-বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে ঠিক সেইভাবে বাপ তাকে আগলে আগলে রেখেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই ছিবলি দেখেছে তার বাপ অন্ধ। তাকে ঘিরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার আর অন্ধকার। সব দিকের সব আলো নিভে গেলেও একটা আলো তার নেভে নি। ছিবলিকে ঘিরে সেই আলোটা সে অনির্বাণ জ্বেলে রেখেছে।

বাপের চোখের ওপর সাদা পর্দা টানা। পৃথিবীতে কোন কিছুই তার দেখবার কথা নয় ; দেখতে পায়ও না। কিন্তু ছিবলির কথা আলাদা। ছিবলির ওঠা-বসা-চলা-ফেরা সব কিছুই যেন সে স্পষ্ট দেখতে পায়। অভিমানে ছিবলির মুখ কতখানি কালো হয়েছে, রাগে কতটুকু লাল—সব নির্ভুল বলে দিতে পারে। ছিবলি যেখানে যতদূরেই যাক, টের পায় বাপের দৃষ্টি সর্বক্ষণ তার পিছু পিছু ঘুরছে। সে দৃষ্টি এড়িয়ে তার কোথাও যাবার উপায় নেই।

ছিবলি তখন কিশোরী। সেই বয়েসে কত লোকই তো তাকে ছোঁ মারবার জন্য ঘুর ঘুর করছিল কিন্তু বিনিদ্র প্রহরী হয়ে বাপ আছে। সে বেঁচে থাকতে ছিবলির সামান্য ক্ষতি কেউ করবে, সাধ্য কি! ছিবলি বুঝতে পারে, কানা হোক খোঁড়া হোক অন্ধ হোক— জগতে টিকে থাকতে হলে যেমনই হোক একটা বাপ থাকা দরকার।

মায়ের স্নেহ থেকে কতখানি বঞ্চিত হয়েছে ছিবলি জানে না। যদি সেদিক থেকে তার কোন ক্ষতি হয়ে থাকে অপার মমতায় বাপ তা পূরণ করে দিয়েছে। চেতনার প্রত্যূষ থেকে শ্রাবণের বর্ষার মত, অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন, বাপেব স্নেহ তার ওপর ঝরে আসছে। স্নিগ্ধ সুখদায়ক একটি আবরণের মত বাপ তাকে নিয়ত ঢেকে রেখেছে।

জগতে বাপ ছাড়া আর কেউ নেই ছিবলির; বাপই তার একমাত্র সঙ্গী। বাপ বল বাপ, মা বল মা, বন্ধু বল বন্ধু, সখা বল সখা—বাপই তার সব। ঝগড়া-অভিমান-রাগ; বাপের সঙ্গেই ছিবলির সকল খেলা।

জগতে এমন অনেক বাপ আছে যারা গম্ভীর; ছেলেমেয়ের কাছে নিজেদের আধেক ঢেকে আধেক রেখে তারা ধরা দেয়। কিন্তু ছিবলির বাপ তেমন নয়; মেয়ের কাছে নিজের সব দিকের সব দুয়ারই খুলে দিয়েছে। ফলে বাপকে সে ভয় করতে শেখে নি; বা তার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখতে শেখে নি। বাপ যদি অবিরত কাছে টানে, মেয়েই বা দূরে থাকে কি করে? ছিবলির জীবনে বাপ হচ্ছে নিকটতম মানুষ।

শ্রদ্ধা করতে নয়, ভক্তি করতে নয়, ভয় করতে নয়—বাপকে চিরদিন ভালবাসতে শিখেছে ছিবলি—সে ভালবাসা বন্ধুত্বের। ঢেউয়ের মত তার প্রাণে যত কথা ওঠে—সে কথা যা-ই হোক, যেমনই হোক—অনায়াসে অসঙ্কোচে বাপকে বলে ফেলে ছিবলি। বাপের কাছে তার বাধা-বারণ নেই, লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই।

তাই সেদিন বাপের সামনে বসে তরল রসের গান্‌খানা

অসঙ্কোচেই ধরেছিল ছিবলি। কি গাইছে হয়ত সে সম্বন্ধে তার নিজেরই খেয়াল ছিল না।

নওলকিশোর আবার বলেছিলেন, 'বাপের কাছে ঐ গানা গাইতে সরম লাগে না?'

মাথা নামিয়েই রেখেছিল ছিবলি। খুব আস্তে বলেছিল, 'জী, না।'

নওলকিশোর একটু অবাক হয়েছিলেন। বাপের সঙ্গে ছিবলিব সম্পর্কটা কেমন তা তাঁর জানবার কথা নয়। যাই হোক এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে অন্য প্রসঙ্গ ধরেছিলেন, 'বেশ, আমার কাছে না হয় তোর লজ্জা লেকেন সারা গঞ্জের লোককে যে শোনাচ্ছিস?'

তার উত্তরে ছিবলি জানিয়েছিল গঞ্জের লোকেরা অশিক্ষিত চাষাভুষো শ্রেণীর। তাদের কাছে তার কোন কুণ্ঠা নেই। কিন্তু টিশন মাস্টার সাহেব 'লিখীপড়ী' বয়স্ক লোক, তাঁর কাছে এমন গান গাইতে তার গলায় আটকে যায়।

অর্থাৎ চাষাভুষো দেহাতী মানুষেরা অনেকটা ছিবলিদের কাছাকাছি; তাদের কাছে সহজ স্বচ্ছন্দ হওয়া যায়। কিন্তু যারা শিক্ষিত ভদ্রমানুষ তাদের কাছে সাবলীল হতে তার বাধে।

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'গানা গানাই। তাতে সরমাবার কিছু নেই।'

তবু কি গাইতে চায় ছিবলি। অনেক বলে বলে, সাধ্যসাধনা করে তার লজ্জা ভাঙিয়েছিলেন নওলকিশোর; শেষ পর্যন্ত ঐ গান খানাই তাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন।

ঐ একখানাই না, আরো দু-তিনখানা গান গাইতে হয়েছিল ছিবলিকে। প্রথম গানটাই চটুল রসের। বাকিগুলো রামচরিত থেকে শুনিয়েছিল ছিবলি। গান শুনে নওলকিশোর পরিতৃপ্ত, মুগ্ধ। অন্য সব দিন স্টেশনের একটা কুলীকে দিয়ে এক আনা করে পাঠিয়ে দিতেন; সেদিন একটা সিকি ছিবলির হাতে দিয়েছিলেন।

ছিবলি বলেছিল, 'এ কি !'

নওলকিশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ?'

'সিকি দিলেন !'

'কেন, কম হল ?'

'না। এক আনা করে পয়সা দিতেন ; আজ এত দিলেন ?'

'তুই যা আনন্দ দিলি লড়কী তাতে প্রাণ ভরে গেছে। সে তুলনায় তোকে আমি কিছুই দিই নি।'

ছিবলি বলেছিল, 'আমার গান শুনে একসঙ্গে এত পয়সা আগে আর কেউ দ্যায় নি।'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'পয়সা কড়ির কথা থাক। আমি কিন্তু আবার এসে তোর গান শুনে যাব।'

এ কথার উত্তর ছিবলি দেয় নি, দিয়েছিল তার বাপ। পাশ থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'জরুর আসবেন ; যখন খুশি আসবেন। যে গানা শুনতে দিল হয় লড়কীকে বলবেন।'

'খুব ভাল কথা।' বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন নওলকিশোর, 'ওরে বাস্‌রে ; দশটা বেজে গেল। সিগন্যাল ডাউন হয়ে গেছে ; এক্ষুনি ডাউন আরা লোকাল এসে যাবে।' নওল-কিশোর স্টেশনের দিকে ছুটতে শুরু করেছিলেন।

সেই যে এসেছিলেন, তারপর থেকে আপ আর ডাউন ট্রেনগুলো পার করাবার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই এসে দাঁড়াতেন নওলকিশোর। রামচরিতের গান শুনে যেতেন।

শুধু আসতেনই না নওলকিশোর, মাঝে মাঝে স্টেশনেও ডেকে পাঠাতেন ছিবলিদের। স্টেশনে ঠিক নয় ; প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে লাল ইটের ছোট্ট একখানি কোয়ার্টার আছে—সেইখানে।

কোয়ার্টারটার জন্ম কবে, কত সালে, কে বলবে। রেলের রেকর্ডে তার খোঁজ মিললেও মিলতে পারে। লাল ইটে নোনা লেগে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। বট আর অশ্বত্থেরা ভিতে শিকড়ের পঞ্চম

বাহিনী চালিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। যে কোনদিন, যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ওটা ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, পড়ে না। ধ্বংসের সব রকম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোয়ার্টারটা নিজের অস্তিত্ব ঠিক টিকিয়ে রেখেছে।

কোয়ার্টার আর কি! একখানি ঘর তার তিন দেওয়ালে তিনটি ছোট জানলা, একটি মাত্র দরজা। সামনের দিকে ঢাকা বারান্দা— সেটা গৌরবে রান্নাঘর। উঠোনের এক কোণে ঝাকড়া-মাথা আওলা গাছের ছায়ায় কুয়ো। কুয়োতলাটা অবশ্য লাল সিমেন্টে বাঁধানো।

একে তো ধনমানিকপুর অতি তুচ্ছ জায়গা; বিহারের মানচিত্রে তার হদিস পর্যন্ত নেই। তার স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার নোনাধরা ভাঙা বাড়ি হবে না তো কি রাজপ্রাসাদ হবে?

কোয়ার্টার নিয়ে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই নওলকিশোরের। যে কোনদিন মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়তে পারে, সে ব্যাপারে দুর্ভাবনাও না। পরম নিশ্চিন্তে, খুব সম্ভব বেশ আনন্দের সঙ্গেই, তিনি এই বয়োঃজীর্ণ ঘরখানার ভেতর দিন কাটিয়ে চলেছেন।

ঘরের এককোণে তক্তপোশে বিছানা পাতা। বিছানার ওপর যে চাদরখানা রয়েছে তার আদি রঙ কি ছিল, নওলকিশোর স্বয়ং হয়ত বলতে পারবেন না। বালিশটা তেলচিটে। তক্তপোশের তলায় একটা ডালাভাঙা টিনের বাক্স। আলনায় গোটাকয়েক রেলের কোট আর ধুতি ঝুলছে। সৃষ্টির পর থেকে বোধ হয় দেওয়ালে কলি পড়ে নি; লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে সেগুলোর গায়ে অসংখ্য ঠিকানা লেখা। ঠিকানাগুলো বুঝবার উপায় নেই; মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত শিলালিপির মত সেগুলো দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। এত ঠিকানা কাদের, তারা কারা, কে বলবে।

এ ঘরের সব চাইতে চমকপ্রদ দৃশ্য হচ্ছে একটি গ্রামোফোন আর অগণিত গানের রেকর্ড। সংখ্যায় যে সেগুলো কত তার হিসেব নেই। রেকর্ডগুলো কোথাও স্তূপীকৃত হয়ে আছে; কোথাও

এলোমেলো ভাবে ছড়ানো।

কোয়ার্টারে একাই থাকেন নওলকিশোর, সংসারে তাঁর কেউ আছে কিনা সে খবর ধনমানিকপুরের কেউ জানে না।

যাই হোক কোয়ার্টারে এনে একের পর এক রামচরিত মানসের গান শুনতেন নওলকিশোর। গানের শেষে ছিবলি আর তার বাপকে পেট ভরে খাইয়ে বিদায় দিতেন।

একদিন নওলকিশোর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ রে লড়কী—'

ছিবলি সাড়া দিয়েছিল, 'জী—'

'রামচরিত ছাড়া আর কোন গানা জানিস না ?'

'জানি তো।'

'কি গানা ?'

ছিবলির মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে বিব্রত ফিসফিস স্বরে সে বলেছিল, 'আপনাকে একদিন শুনিয়েছিলাম না ?'

ধরতে না পেরে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'কবে বল্ তো ?'

'ঐ যে সেদিন। আপনার কিছুই মনে থাকে না; সব ভুলে যান।'

এবার মনে পড়ে গিয়েছিল নওলকিশোরের। উৎসাহের স্বরে বলে উঠেছিলেন, 'ও, নয়না মারকে মাত যাও, মাত যাও--সেই গানটা তো ?'

'জী—'

'ওরকম গানা আর জানা আছে ?'

'জী—'

'গা—'

'আমার সরম লাগে।'

'আবার সরমের কথা বলছিস ? বলেছি না গানা গানাই—গা।'

একটু চুপ করে থেকে গান ধরেছিল ছিবলি। চটুল প্রেমের গান। কিন্তু এ জাতীয় গানের সঞ্চয় তার অফুরন্ত নয়—মাত্র চার পাঁচটি। নিমেষেই তা ফুরিয়ে গিয়েছিল।

নওল কিশোর বলেছিলেন, 'ব্যস্ ?'

ছিবলি বলেছিল, 'জী, ঐ চার পাঁচটাই জানি।'

'আর কী জানিস ?'

একটু ভেবে ছিবলি জানিয়েছিল, পশ্চিম বিহারের কিছু কিছু পল্লীগীতি তার জানা আছে। চোখ বড় বড় করে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'হাঁ ?"

'জী।'

'তবে আর বসে আছিস কেন ? — আরম্ভ করে দে।'

ছিবলি গান ধরেছিল :

'আঙ্গন যব আওল মোহনিয়া—
দিলো মে বাওল (বাজলে) বাঁশুরিয়া।'

পল্লীসঙ্গীতের পুঁজিও তার সামান্যই ; দশ বারোটার বেশি হবে না। এ ক'টা গান গাইতে কতক্ষণ আর লাগে !

নওলকিশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর কিছু জানা আছে ?'

'জী না, যা জানতাম সব আপনাকে শুনিয়েছি।' ছিবলি বলেছিল।

একটু চুপ করে থেকে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'লেকেন—'

'কী ?'

'তোর যা গলা তাতে এই ক'টা গানা জানলেই চলবে না : আরো শিখতে হবে।'

কিছু না বলে ছিবলি হেসেছিল।

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'হাসলি যে ?'

'আপনার কথা শুনে।' ছিবলি হেসেই যাচ্ছিল।

নওলকিশোর রেগে গিয়েছিলেন, 'আমি তোকে হাসির কথা বলেছি ?'

'বলেন নি ?'

'গানা শেখার ভেতর হাসির কথা এল কোত্থেকে ?'

এবার আর হাসে নি ছিবলি। খানিক বিষণ্ণ মুখে বলেছিল, 'আপনি তো আমাদের সব কথাই জানেন। আমরা গরীব, ভিখ মাঙোয়া। কে আমাকে গানা শেখাবে আর গানা শেখার সময়ই বা আমার কোথায় ?'

'তা একটা কথা বটে।' নওলকিশোরকে চিন্তিত দেখিয়েছিল। খানিকক্ষণ কি যেন তিনি ভেবেছিলেন। হঠাৎ চোখমুখ উৎসাহে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'হয়েছে।'

'কী ?'

'তোর গানা শেখার বন্দোবস্ত আমি করব।'

'আপনি !'

'হাঁ রে লড়কীয়া, হাঁ।'

ছিবলির বিস্ময় কাটে নি। সে বলেছিল, 'আপনি গানা জানেন ?'

'নহী।' নওলকিশোর মাথা নেড়েছিলেন।

'তব্ ?'

কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়। সেদিকে চোখ পড়তেই চকিত হয়ে উঠেছিলেন নওলকিশোর, 'ধন্নুয়া ঘন্টি দিচ্ছে ; এক্ষুনি থারটিন আপ লোকাল এসে যাবে। তোর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। কাল আসিস ; আমি চললাম।' দড়ি থেকে একটা রেলের কোট টেনে হাত গলাতে গলাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন।

পরের দিন অন্ধ বাপের হাত ধরে আবার এসেছিল ছিবলি। বলেছিল, 'গানা শিখতে এলাম, শেখান।'

'ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলি যে ! বোস্—'

ছিবলিরা বসেছিল।

নওলকিশোর তক্তপোশের তলা থেকে গ্রামোফোন বার করে

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দম দিতে শুরু করেছিলেন।

আগে আর কখনও গ্রামোফোন দেখে নি ছিবলি। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'এটা কী মাস্টারজী?'

রহস্যময় হেসে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'তুই বল্—'

'আমি জানি না।'

'তবে চুপ করে বোস্। এক্ষুনি বুঝতে পারবি এটা কী।'

ছিবলির সম্পূর্ণ অস্তিত্বটা সীমাহীন ভীরুতা দিয়ে ঘেরা। যার জীবন অন্যের করুণায় পুষ্ট ভয় ছাড়া তার প্রাণে আর কোন ভাবের খেলা সম্ভব?

কিন্তু ভীরুতার যে দুর্গে ছিবলির বাস তার দেওয়ালগুলো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন নওলকিশোর। তিনি দূর থেকে দু-চার পয়সার করুণা ছুঁড়েই চলে যান নি; যেচে এগিয়ে এসেছেন। হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন।

একজন যদি অবিরত কাছে টানে আরেকজন ভয়ের অজুহাতে ক'দিনই বা দূরে দূরে থাকতে পারে। সঙ্কোচ-সংশয়-ভীরুতা সব জয় করে ছিবলিও নওলকিশোরের দিকে অনেকখানি এগিয়েছে। এতকাল বাপই ছিল তার একমাত্র সহচর, তার সকল খেলার সঙ্গী। বাপকে ঘিরেই ছিল তার নিয়ত ঝগড়া-রাগ-অভিমান। ইদানীং বাপের সঙ্গে তার খেলাগুলি যেন ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছিল। সমান দু ভাগ না। নিজের অজান্তে কিছু কিছু অভিমান রাগ বা আনন্দ নওলকিশোরের জন্য সে আলাদা করে রাখছিল।

আবদারের ভঙ্গিতে জেদী আদুরে মেয়ের মত ছিবলি বলেছিল, 'বলুন না মাস্টারজী—'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'এটার নাম গ্রামোফোন।'

'কী হয় এতে?'

'কলে গান হয়। তুই এটা থেকেই গান শিখবি।'

বাক্সের মতন একটা কলের ভেতর থেকে গান বেরুতে পারে,

এমন অদ্ভুত কথা আগে আর শোনে নি ছিবলি। তাব বিস্ময় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। বিমূঢ়ের মতন সে তাকিয়ে ছিল।

এদিকে দম দিয়ে নতুন পিন লাগিয়ে রেকর্ড বাজাতে শুরু করেছিলেন নওলকিশোর। গানটা ছিল মৈথিলী ভাষার একখানা কীর্তন।

ছিবলি যত না বিস্মিত তত মুগ্ধ। তার চোখের পাতা নড়ছিল না। স্থির নিষ্পলকে সে শুধু দেখছিল। দেখছিল এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় কানের ভেতর জড়ো করে শুনছিল। কালো গোলাকাব একখানা চাকতিব (গানেব রেকর্ড) ওপর ছুঁচেব মতন সরু একটি পিন রেখে ঘোরালে এমন চমৎকাব শ্রুতি-মনোহব একখানা গান যে বেরুতে পাবে কে তা ভাবতে পেরেছিল। তা ছিল ছিবলির সুদূর কল্পনাবও বাইরে।

ছিবলির জীবনে এ এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বৈকি! গানটা শুনতে শুনতে তাব সমস্ত সত্তাব ভেতব নিঃশব্দে একটা বিপ্লব যেন ঘটে যাচ্ছিল। অথবা ঝড়, ভূকম্পন বা জলোচ্ছ্বাসেব মতন কোন বিপুল অশান্ত প্রতিক্রিয়া।

এক সময় গান শেষ হয়েছিল। মৃদু হেসে নওলকিশোর জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কেমন লাগল রে লড়কীয়া?’

ছিবলির বিমোহিত অস্তিত্বের ভেতর থেকে উত্তবটা যেন উঠে এসেছিল, ‘বহুত আচ্ছা। এ্যায়সা গানা আমি আব কখনও শুনি নি।’

নওলকিশোর কিছু না বলে আরেকখানা রেকর্ড বাজিয়েছিলেন। তারপর আবেকখানা। একের পর এক। গানগুলোর কোনটা গম্ভীর, কোনটা চটুল রসের, কোনটা বিষাদে করুণ, কোনটা রসে হাস্যে সমুজ্জ্বল।

প্রথমত কালো চাকতির ভেতর থেকে কি ভাবে গান বেরিয়ে আসছে, ছিবলির কাছে তা-ই এক রহস্য। কিভাবে ওগুলোর মধ্যে

অমন রমণীয় সুরের জাহু ধরে রাখা হয়েছে কে তা বলে দেবে। ধনমানিকপুরে আসার আগে জীবন ধারণ নামে সেই ব্যাধটার তাড়া খেয়ে সারা আর্যাবর্ত সে ছুটে বেড়িয়েছে। সে সময় কিছু কিছু অখ্যাত দেহাতী গায়কের গান যে শোনে নি তা নয়। কিন্তু এমন দুর্লভ কিন্নরকণ্ঠ আগে আর কখনও তার শোনার সুযোগ হয় নি।

অনেকগুলো রেকর্ড বাজাবার পর ছিবলির দিকে তাকিয়েছিলেন নওলকিশোর।

ছিবলি বলেছিল, 'মানুষের গলা এত ভাল হয়, জানতাম না।'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'তোর গলা এদের চাইতেও ভাল।'

'হুঁ, আপনি বললেই হল!'

'আমি বললেই হবে।'

ছিবলি জিজ্ঞেস করেছিল, 'ঐ কালো চাকতিগুলো কি বলে?'

'রেকর্ড।'

'রেকড?'

'উঁহু, রেকর্ড।'

শব্দটা ঠিকমত উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছিল ছিবলি, পারে নি। কলহাস্যে স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার মুখরিত করে বলেছিল, 'আমি রেকডই বলব।'

'তাই বলিস।' নওলকিশোর হেসে ফেলেছিলেন।

'আপনি বললেন রেকডের গানার চাইতে আমার গানা ভাল।'

'বলেছি তো।'

'আমার কান আছে। আমি বুঝতে পারি আমার গানার সঙ্গে রেকডের গানার তুলনাই হয় না। আপনি বললেই আমার গানা বেশি ভাল হবে না।'

কৌতুকে চোখ দুটি মিট মিট করছিল নওলকিশেরের, কিছু বলেন নি।

ছিবলি বলেছিল, 'চোখ অমন করছেন কেন?'

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'ছাখ্ ছিবলি, গানা বাজনা আমার প্রাণ; ছেলেবেলা থেকে এতে মজে আছি। কোন গলা ভাল কোনটা মন্দ, একবার শুনলেই বুঝতে পারি।'

ছিবলি কিছু বলে নি।

নওলকিশোর থামেন নি, 'এই যারা রেকর্ডে গানা গায় তাদের বেশির ভাগেরই গলা ঘষে মেজে তৈরি করা। তা ছাড়া আরো অনেক রকম কাবচুপি আছে।'

'কি রকম?'

'গলায় যেটুকু খামতি আছে ভাল ভাল বাজনা বাজিয়ে তা ঢেকে দেওয়া হয়। সে সব এখন তুই বুঝতে পারবি না; শুনতে শুনতে পারবি।'

ছিবলি চুপ।

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'এই সব গায়কদের বেশির ভাগেরই থালি গলার গানা বসে শোনা যাবে না; সুর ধরলেই উঠে যেতে হবে। লেকেন—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল ছিবলি।

'তোর গলা ঘষামাজা করা নয়; ও গলা ভগোয়ানের দেওয়া।' বলতে বলতে ঘোর লেগে গিয়েছিল নওলকিশোরের। তিনি যেন কবি হয়ে উঠেছিলেন, 'তুই বসন্তের কোয়েলা ছিবলি, বসন্তের কোয়েলা।'

কণ্ঠস্বর কাঁপছিল নওলকিশোরের, চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল আচ্ছন্ন। দুরন্ত এক আবেগ তাঁকে যে অস্থির করে তুলেছে, টের পাওয়া যাচ্ছিল।

এই আচ্ছন্ন মুগ্ধ ঘোরলাগা মানুষটির দিকে তাকিয়ে ছিবলির বুকের দুর্জ্ঞেয় অংশে কিসের এক ছায়া বুঝি পড়েছিল। সে কি সংশয়ের? সে কি ভয়ের? সে কি নাম-না-জানা অন্য কোন অনুভূতির?

নওলকিশোর প্রৌঢ়; তার বাপের বয়সীই হবেন। দু-চার বছর

বেশি তো কম নয়। ছিবলি অবশ্য কিশোরী। কিশোরী হলেও মেয়ে তো। দেহের কুঁড়ি তার ফুটবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তা ছাড়া শরীরকে পেছনে ফেলে মন তার অনেক দ্রুত অনেক কদম এগিয়ে গেছে। না এগিয়ে উপায়ই বা কী!

শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচবার জন্য জ্ঞান হবার পর উত্তর প্রদেশের সুদূর প্রান্ত থেকে বাঙলা দেশের সীমানা পর্যন্ত অবিরত ছুটে বেড়িয়েছে ছিবলি। মনুষ্য চরিত বিশেষ করে পুরুষের স্বভাব তার কাছে অজানা রহস্য নয়। চোখের দৃষ্টি কি মুখের চামড়ার কুঞ্চন দেখে সে মানুষের মনের অভিসন্ধি টের পায়। ঘাড় হেলিয়ে অথবা বাঁকা হেসে কে কি ইঙ্গিত করছে, অনায়াসেই ছিবলি বুঝতে পারে।

সেই বয়েসেই ছিবলি জেনে ফেলেছে, বাপের বয়সীই হোক কি চিতায় উঠবার বয়সই হোক, পুরুষ পুরুষই ; তার ভোগের তৃষ্ণা তার দুর্বার কামনা মৃত্যুহীন, অনির্বাণ। ছিবলি জেনেছে এ দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লম্পটের অভাব নেই। কিশোরী ভজন করতে চায় এমন বহু বয়স্ক লোক সে বিহারে উত্তর প্রদেশে দেখেছে।

নওলকিশোর সম্বন্ধে তার সংশয় কিংবা ভয় অকারণে নয়। তাদের মত মানুষকে দূর থেকেই লোকে করুণা ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু নওলকিশোর দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন নি। কাছে এসেছেন, কাছে টেনেছেন। তারপর ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে তার বন্দনা শুরু করেছেন।

ছিবলি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ; অজ্ঞাতসারে নিজের দিকে চোখ ফিরিয়েছিল সে। দেহের কুঁড়িটি তার বুঝি কুঁড়ি নেই। ছিবলি টের পেয়েছিল সত্তার ভেতর আলোড়ন তুলে জোয়ার আসছে। আসন্ন প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে সে অনুভব করেছিল তার সমস্ত অস্তিত্ব সর্বক্ষণ থর থর করছে।

বুকের গহন কেন্দ্রে খানিকটা ছায়া নিয়ে সন্দিগ্ধ সুরে ছিবলি বলেছিল, 'লেকেন—'

'কী ?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন নওলকিশোর।

'একটা কথা বললে নারাজ হবেন না তো ?'

'না ; তুই বল্।'

'আমাকে গানা শেখাবার জন্যে আপনার এত গরজ কেন ?'

প্রথমটা চকিত হয়ে উঠেছিলেন নওলকিশোর। স্থির নিবদ্ধ চোখে কিছুক্ষণ ছিবলির দিকে তাকিয়ে থেকে উদাস সুরে বলেছিলেন, 'এখন না, পরে বুঝবি।'

ছিবলি এ প্রসঙ্গে আর প্রশ্ন করে নি।

যাই হোক তারপর থেকে পিপুল গাছের ছায়ায় বসে গান গেয়ে রোজগারের ফাঁকে ফাকে নওলকিশোরের কোয়ার্টারে এসে রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে গলা সেধেছে ছিবলি। ছিবলি যেন বনের সেই পাখিটি, শোনামাত্র যে গলায় গান তুলে নিতে পারে। পৃথিবীর যে কোন মধুর শব্দ, শ্রুতিসুখকর ধ্বনি নিমেষে সে নকল করতে পারে। দেখতে দেখতে অনেক গান শিখে ফেলেছিল সে—তরল রসের এবং গভীর রসের প্রেমের গান, ভক্তিমূলক গান, পল্লীগীতি, ঠুংরি ইত্যাদি ইত্যাদি।

একেকটা গান শেখা হত আর নওলকিশোর ফরমাশ করতেন, 'নে, এবার গা দেখি—'

ছিবলি গান শুরু করত ; শুনতে শুনতে চোখ বুজে আসত নওলকিশোরের। গান শেষ হলে বলতেন, বাঃ, 'বাঃ, বহুত বড়িয়া—'

গানের শেষে একদিন ছিবলি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা মাস্টারজী—'

চোখ মেলে নওলকিশোর বলেছিলেন, 'কী বলছিস ?'

'এতে কী লাভ ?'

'কিসে রে ?'

'ঘরেই তো আপনার গানা-বাজনার সরঞ্জাম আছে ; কল খুলে দিলেই শুনতে পারেন। তবে—'

'তবে কী ?'

আমাকে দিয়ে সেই গান গাইয়ে কী আরাম যে পান বুঝতে পারি না।

নওলকিশোর মৃদু হেসেছিলেন ; কোন উত্তর ছান নি।

ছিবলি বলেছিল, 'হাসলে চলবে না ; বলুন—'

'আসল কথাটা কি জানিস ছিবলিয়া, কল চালালে যে গান বেরোয় তাতে মজা লাগে না।'

'তবে ঘর যে রেকর্ডে ভরে ফেলেছেন !'

'সে তো দায়ে পড়ে।'

বুঝতে না পেরে ছিবলি ঈষৎ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়েছিল।

নওলকিশোর বলেছিলেন, 'তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বুঝতে পারিস নি।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিল ছিবলি।

নওলকিশোর এবার ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'আরে বাপু যে গাইছে সে যদি সামনেই না বসে রইল, তার মুখই যদি দেখতে না পেলাম তবে কিসের গান !'

ছিবলি অবাক। বলেছিল, 'মুখ দেখে কি হয় !'

'বুঝতে পারি যে গাইছে সে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা। গানের ভেতর কতখানি দরদ ঢেলে দিচ্ছে মুখ দেখে টের পাওয়া যায়।'

ছিবলি কিছু না বলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল।

নিয়মিত যাওয়া-আসার ফলে নওলকিশোর সম্বন্ধে ছিবলির প্রাণে শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ, কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সম্পর্কটা সহজ, স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল হয়ে গিয়েছিল। অজ্ঞাতসারে নওলকিশোরের জীবনের অন্তঃপুরে সে যেন পা ফেলতে শুরু করেছিল।

নওলকিশোরের জীবনের কিছুটা অংশ ছিবলির চোখে দেখা। তিনি এখানকার স্টেশনমাস্টার, টিকিট কালেক্টর, বুকিং ক্লার্ক—একাই সব কিছু। কুলীরা কেউ কাছে না থাকলে মাঝে মাঝে আপ

আর ডাউন গাড়িগুলোকে ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে তাঁকেই পার করতে দেখা যায়।

ছিবলি লক্ষ্য করেছে ধনমানিকপুর স্টেশনে আপ আর ডাউন ট্রেনগুলো থেকে কাছের এবং দূরের যত যাত্রী নামে তাদের প্রায় সবার সঙ্গেই নওলকিশোরের পরিচয়। প্রত্যেকের নাম জানেন তিনি, ঘর সংসারের খবর জানেন। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে করতে সমানে কথা বলেন। হাতের সঙ্গে সঙ্গে সমানে তাঁর মুখ চলতে থাকে। দু-চারটে কথা না বলে কারো ছাড়া পাবার উপায় নেই।

নওলকিশোর হয়ত বলেন, 'কি রে ছলিয়া, তোর ছেলেটার বুখার হয়েছিল না ?'

ছলিয়া নামধারী লোকটা জবাব দেয়, 'জী—'

'এখন কেমন আছে ?'

'সেই একরকম, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।'

'এক কাজ কর ছলিয়া, আরা শহরে বড়া কবিরাজ দেওকীরাম শর্মা আছে—তার কাছে লড়কাকে নিয়ে চলে যা। শর্মাজীর দাওয়াতে জরুর সেরে যাবে।'

ছলিয়ার পর আসে সুরতিয়া। তার হাত থেকে টিকিটখানা নিতে নিতে হয়ত নওলকিশোর জিজ্ঞেস করেন, 'লড়কীর সাদি হল তোর ?'

সুরতিয়া নামে দেহাতী মানুষটা বলে, 'না ; ভাল লড়কাই তো পাচ্ছি না। বহুত চিন্তায় আছি মাস্টারজী। আপনার খোঁজে লড়কা-উড়কা আছে।'

একটু ভেবে নওলকিশোর বলেন, 'আছে। তুই কালই রৌশনপুর চলে যা। ওখানে সখিলাল সাওয়ের সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবি। সখিলালের একটা লড়কা আছে ; লিখিপড়ী আচ্ছা লড়কা। ঘরও ভাল ; ক্ষেতিবাড়ি আছে চল্লিশ বিঘা ; বাগ-

বাগিচা আছে। ভঁইষা আছে বিশটা। বয়েল গাড়ি সাত আটটা। ছেলের সাদি দেবে বলে সখিলাল একটা লড়কীর খোঁজ করছিল। জরুর তুই কাল চলে যাবি।'

'যাব।'

সুরতিয়ার পর লছমীর নানা। কোমরবাঁকা ত্রিভঙ্গ বুড়ার ভিক্ষেই জীবিকা। ট্রেনে করে কোথায় কোথায় চলে যায় সে। সারাদিন ভিক্ষের পর সন্ধ্যেবেলা ধনমানিকপুর ফেরে। চিরদিনই সে বিন্ টিকিটের যাত্রী। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কাছে এলে নওলকিশোর বলেন, 'আর কতকাল কষ্ট করবে লছমীর নানী?'

বুড়ী কপাল দেখিয়ে বলে, 'নসীব যদ্দিন করাবে।'

'তোমার ছেলের কাছে বরং চলে যাও; সে তো তোমাকে চায়। কতবার নিতে এসেছে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বুড়ী, 'না মাস্টারজী—'

'না কেন?'

অনেক কাল আগে ছেলে, ছেলের বৌর ওপর অভিমান করে সংসার ছেড়ে চলে এসেছিল লছমীর নানী; তারপর থেকে ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। ছেলে বহুবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে; বুড়ী ফেরে নি। অভিমান এবং দুঃখের সঙ্গে জেদ মিশে তাকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। লছমীর নানী বলে, 'আপনি তো সবই জানেন।'

নওলকিশোর বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'জানি। তবু বলছি ছেলের কাছে চলে যাও। এই শেষ বয়সে একটু আরাম দরকার; যত্ন দরকার।'

'না; কিছু দরকার নেই। লাঠি ঠুক ঠুক করে বুড়ী চলে যায়।

লছমীর নানীর পর হয়ত আসে ভুবনেশ্বর। নওলকিশোর জিজ্ঞেস করেন, 'এক বিঘে ক্ষেতি নিয়ে তোর যে মামলা চলছিল তার ফয়সালা হল?'

'জী, না।' ঘাড়ের দু-ধারে ভুবনেশ্বর মাথা হেলায়।

'পাঁচ সাল ধরে তো মামলা চলছে! আর কতকাল চলবে?'

'মালুম হচ্ছে আমি যদ্দিন জিন্দা আছি।'

প্রতিদিন স্টেশন গেটের মুখে দাঁড়িয়ে টিকিট নিতে নিতে নানা মানুষের সুখদুঃখের খবর নেন নওলকিশোর। কার অসুখ সারছে না, কার মামলা মিটছে না, কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, জলের অভাবে কার ক্ষেতি জ্বলে গেছে—এই সব সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারলে নওলকিশোরের শান্তি নেই। নওলকিশোরকে এই স্টেশন ছেড়ে কোনদিন কোথাও যেতে দেখে নি ছিবলি, সে শুনেছে অনেক কাল আগে সেই যখন এ লাইনে প্রথম ধনমানিকপুর স্টেশন বসল সেই সময় এখানে এসেছিলেন নওলকিশোর। এর ভেতর একটা দিনের জন্যও কেউ নাকি তাঁকে স্টেশনের বাইরে যেতে দ্যাখে নি।

ধনমানিকপুরের এই নগণ্য তুচ্ছ স্টেশনটার সঙ্গে আপন অস্তিত্ব একাকার করে দিয়েছেন নওলকিশোর। স্টেশন আর নওলকিশোর —এই দুটি আলাদা কিছু নয়। দুইয়ে মিলে এক অখণ্ড অচ্ছেদ্য সত্তা।

সেই যে কে এক গণৎকার ছিল, খড়ি পেতে ভূ-ভারতের খবর বলে দিতে পারত, নওলকিশোর যেন তা-ই। এই স্টেশনে বসে তিনি আশে-পাশের বিশ পঁচিশটা গ্রামের যত মানুষ আছে তাদের সব কথা বলে দিতে পারেন। ধনমানিকপুরকে ঘিরে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের মত যে ভূখণ্ড তার ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছেন নওলকিশোর।

শুধু খবর সংগ্রহ করেই শান্তি নেই নওলকিশোরের, সকলের দুঃখ এবং সমস্যার সাধ্যমত প্রতিকার করতেও চেষ্টা করেন তিনি।

ছিবলি লক্ষ্য করেছে, টিকিট বিক্রি, গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ, ট্রেন পারাপার, লোকজনের সঙ্গে অবিরাম কথা বলা ইত্যাদির পর, কোয়ার্টারে চলে যান নওলকিশোর। স্টেশনে যতক্ষণ থাকেন

ততক্ষণ তাঁর হাজারো সঙ্গী ; বিপুল জনতা সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকে। কিন্তু কোয়ার্টারে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। জীবন সেখানে নারীসঙ্গহীন, নিরুৎসব। কেরোসিনের একটা স্টোভে কোনদিন চাট্টি ভাত ফুটিয়ে নেন, তবে বেশির ভাগ দিনই পাঁউরুটি-টুটি দিয়েই দিন কাটিয়ে ছান। রান্না-বান্নার ঝামেলা তাঁর ভাল লাগে না। যেটুকু সময় কোয়ার্টারে থাকেন হয় ঘুমোন, নইলে গ্রামোফোন চালিয়ে একের পর এক গান শোনেন।

একদিন ছিবলি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা মাস্টারজী, আপনার দেশ কি এখানেই ?'

'না।' আস্তে মাথা নেড়েছিলেন নওলকিশোর।'

'কোথায় তা হলে ?'

'ভাগলপুর জিলা, গাঁও সব্‌জিমণ্ডী।'

'সেখানে কে আছে ?'

নওলকিশোর হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন ; কোন উত্তর ছান না।

'বাপ ?'

'নহী ; আমার জন্মের পরই মারা গেছে।'

'মা আছে ?'

'নহী।'

'ভাই-বহেন ?'

'নহী ; কেউ নেই।'

একটু কি ভেবে খানিক ইতস্তত করে ছিবলি বলেছিল, 'আপনি তো এখানে একাই থাকেন।'

নওলকিশোর উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, কেন ?'

'আপনি সাদি করেন নি, লড়কা-উড়কা নেই ?'

বিচিত্র হেসেছিলেন নওলকিশোর, 'ছাখ্‌ ছিবলিয়া, দুনিয়ায় আসতে হলে একটা মা একটা বাপের দরকার হয়ই ; ও দুটো ছাড়া

জনম সম্ভব না। আর ভাই বোন থাকাও খুব তাজ্জবের ব্যাপার নয়। আর বয়েস হলে জওয়ানি এলে সাদিও হয়, দু-একটা বাচ্চাও হয়। লেকেন—'

'কী ?'

'ওসব তো বড় কথা নয় ছিবলিয়া—'

ছিবলি অবাক, 'বড় কথা নয় !'

নওলকিশোর দৃঢ় স্বরে বলেছিলেন, 'না।'

'তবে কোনটা বড় কথা ?'

নওলকিশোর যেন শুনতে পেলেন না। নিজের বুকে আঙুল রেখে দূরমনস্কের মত বললেন, 'এর ভেতর যা আছে তার খবর নিতে চেষ্টা কর। তা যদি জানতে পারিস তা হলেই সব জানা হল। বাপ-ভাই-বহেন-বহু, এ সবের খবর অন্য কেউ জিজ্ঞেস করুক। তুই গুণী, শিল্পী—অন্য কথা জিজ্ঞেস কর।'

নওলকিশোরের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে নি ছিবলি। মানুষটিকে কেমন যেন রহস্যময় আর দুর্জ্ঞেয় মনে হয়েছিল। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল, 'আচ্ছা মাস্টারজী—'

'বল্—'

'কত সাল আপনি এখানে আছেন ?'

'তিশ (তিরিশ) সাল।'

'তিশ সাল !'

'হাঁ—' মৃদু হেসেছিলেন নওলকিশোর। বলেই কিছুক্ষণের জন্য ধূসর স্মৃতিলোকে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করেছিলেন—অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর করে যেন ভেসে এসেছিল, 'সে কি আজকের কথা ; কোম্পানী এখানে রেলের লাইন খুলল, স্টেশন বসাল আর সেই বছরই আমি স্টেশন মাস্টারের চাকরি পেলাম। চাকরি পেয়ে সটান এখানে চলে এলাম। সেই থেকে ধনমানিকপুরেই আছি। মালুম হচ্ছে—'

জিজ্ঞাসু সুরে ছিবলি বলেছিল, 'কী ?'

'যদ্দিন বাঁচব এই ধনমানিকপুরে আপ আর ডাউন গাড়ি পার করিয়েই যেতে হবে।'

তারপর কত দিন কেটে গেছে। মাসের পর মাস এসেছে, ঋতুচক্রে সময় পাক খেয়ে ফিরেছে। একদিন ছিবলির প্রাণে নওলকিশোর সম্বন্ধে যে সংশয়ের ছায়াটুকু পড়েছিল কবে যে তা বিলীন হয়ে গিয়েছিল, সে টেরও পায় নি। নওলকিশোরের ব্যবহার, কথাবার্তা, তাঁর প্রতিদিনের সঙ্গ বুঝিয়ে দিয়েছে ভয়ের কিছু নেই। পুরুষের স্বভাবের ভেতর একটা করে হিংস্র শ্বাপদের বাস ; প্রায় সর্বক্ষণই সে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েমানুষ, বিশেষ করে যুবতী মেয়ে কাছে এলেই সত্তার ভেতরে কোন এক গোপন অন্ধকার গুহা থেকে লাফ দিয়ে সে বেরিয়ে আসে। যুবতীদেহ সম্পূর্ণ গ্রাস না করা পর্যন্ত তার মত্ততার শেষ নেই।

কিন্তু তার প্রতি নওলকিশোরের আকর্ষণ, তাকে কাছে ডাকা, রেকর্ড বাজিয়ে গান শেখানো—এর সব কিছুই ভয়লেশহীন। তার ভেতর শ্বাপদের লালসা নেই, থাকলে এতদিনে টের পেয়ে যেত ছিবলি। পুরুষের ভেতর হিংস্র বাঘই থাকে না, অনেক সময় ক্রূরকুটিল সরীসৃপও থাকে। নিঃশব্দ সঞ্চারে এগিয়ে এসে শতপাকের বেষ্টনে সে জড়িয়ে ধরে। নওলকিশোরের স্বভাবে কুটিলতা বা চাতুরালি নেই। তিনি বাঘও নন, সরীসৃপও না। ছিবলি সম্বন্ধে তাঁর প্রাণে একটি অনুভূতিরই খেলা—তার নাম স্নেহ। সে স্নেহ শুদ্ধ, নিখাদ, খাঁটি পাকা সোনার মতন। কিছুদিনের মধ্যেই ছিবলি বুঝেছে নওলকিশোরের মনখানি মন্দিরের মত পবিত্র। সেখানে রজোঃগুণের চিহ্নমাত্র নেই। সেখানকার সব কিছুই সাত্ত্বিকতা দিয়ে ঘেরা।

যুবতী মেয়ের দেহ এবং মন দুই-ই অপরিসীম স্পর্শকাতর। যে কোন ছোঁয়া, তা যত ক্ষীণ আর আলতোই হোক, জলে ঢিল পড়ার

মতন সমস্ত সত্তাকে শিউরে দিয়ে ঢেউ উঠবে। সে অস্থিরতা সে কম্পন সহজে থামে না। ওপর দিকে না থাকলেও অস্তিত্বের গভীরে তা তির তির করতেই থাকে।

শুধু কাছে ডাকাই নয়, নওলকিশোরের স্নেহের তাপ নানাভাবে পেয়ে এসেছে ছিবলি। একেকদিন হন্তদন্ত হয়ে নিজেই পিপুল গাছের ছায়ায় ছুটে এসেছেন নওলকিশোর, 'এ্যাই ছিবলি, শিগ্‌গিব চল্—'

ছিবলি হয়ত তখন গাইছে। গান থামিয়ে বলেছে, 'এখন কি করে যাব! সবে বাজাব জমেছে; দুটো চারটে পয়সা পড়ছে।'

'তুই ওঠ্ দিকি—'

অনিচ্ছার স্বরে ছিবলি বলেছে, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

নওলকিশোর তাড়া দিয়ে উঠেছেন, 'আয় না, এলেই দেখতে পাবি।'

না যাবার পক্ষে ছিবলি আরো কিছু বলতে চেয়েছে কিন্তু তার আগেই পাশ থেকে বুড়ো বাপ বলে উঠেছে, 'খুদ মাস্টারজী ডাকতে এসেছে। তক্ক না করে চল্ দিকি। ওঠ্—'

কাজেই উঠে পড়তে হয়েছে। নওলকিশোরের পিছু পিছু স্টেশনে এসে ছিবলি দেখেছে, ক'জন লোক হয়ত বসে আছেন। পোশাকে আশাকে বেশ শৌখিন রইস লোক তাঁরা।

নওলকিশোর বলেছেন, 'তোর জন্যে এঁদের বসিয়ে রেখেছি।'

বিমূঢ়ের মত ছিবলি তাকিয়ে থেকেছে।

নওলকিশোর বলেছেন, 'নহরপুরের নাম শুনেছিস তো?'

মাথা নেড়ে ছিবলি জানিয়েছে, জানে।

যাঁরা বসে ছিলেন তাঁদের দেখিয়ে নওলকিশোর বলেছেন, 'এঁরা নহরপুরের লোক। মস্ত বড় আদমী, আমার বন্ধু।'

পরিচয় সত্ত্বেও ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেছে। কেন নওলকিশোর পিপুল গাছের তলায় জমজমাট আসর থেকে তাকে

তুলে এনেছেন বোঝা যায় নি।' বিমূঢ়তা কাটে নি ছিবলির। নিষ্পলকে, খানিক সংশয়ে, খানিক ভয়ে, তাকিয়ে থেকেছে সে।

নওলকিশোরই এবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'এঁদের বাড়ি আজ বিয়ে। গান বাজনার একটু বন্দোবস্ত করেছেন। আমি তোর কথা এঁদের বলেছি। এক রাত গেয়ে আসবি, পাঁচ টাকা নগদ পাবি আর বাপ-বেটি দু জনে দু-বেলা খাবি। কি, রাজী?'

এক রাত গান গেয়ে নগদ পাঁচটা টাকা! সারা দিন পিপুল গাছের তলায় গলা ফাটিয়ে মুখে রক্ত তুলে কত রোজগার করে সে? আট দশ আনার বেশি নিশ্চয়ই না। তা হলে পাঁচ টাকা আয় করতে তার ক'দিন লাগবে?

ছিবলি কিছু একটা বলতে চেয়েছে, পারে নি। কৃতজ্ঞতায় তার গলা রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

শুধু বিয়ে বাড়িতেই না, এই ধনমানিকপুরে কিংবা দূর দেহাতে যেখানে প্রমোদের অঙ্গ গান বাজনা সেখানেই কিছু টাকার বিনিময়ে এক আসর করে গাওয়াবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নওলকিশোর।

এই মানুষটির কাছে যেতে হয় নি; নিজেই তিনি এগিয়ে এসেছেন, অযাচিত অকুণ্ঠ স্নেহে ছিবলিকে ভরে দিয়েছেন। ছিবলির জীবনে এ এক পরম পাওয়া।

অথচ এই মানুষটির জীবনের কতটুকুই বা সে জেনেছে! টিকিট বিক্রি করা, গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট সংগ্রহ, রেকর্ড বাজিয়ে গান শোনা, যাত্রীদের সঙ্গে গল্প—মাত্র এটুকুই তার জানা। এর বাইরের আর সব কিছুই অপরিচয়ের অন্ধকারে ঘেরা। তা হোক; তাঁর সংসারের তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি নাই জানুক ছিবলি, অন্য আরেকটি খবর সে জেনেছে। নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে নওলকিশোর একদিন বলেছিলেন, 'এর ভেতর কী আছে জানতে চেষ্টা কর।' পুরোপুরি না হলেও ভেতরকার খানিকটা খবর সে জেনেছে বৈকি।

অসীম স্নেহই নওলকিশোরের স্বভাবের সব চাইতে বড় দিক;

অকারণে অকাতরে তিনি চারদিকে তা বিলিয়ে চলেছেন। ছিবলি তার খানিক ভাগ পেয়েছে মাত্র। ছিবলি না হয়ে আর কেউ হলেও তার ভাগ পেত। এই ব্যাপারে নওলকিশোরের পক্ষপাতিত্ব নেই।

নওলকিশোরই শুধু না, এই ধনমানিকপুরের প্রায় সবার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে ছিবলিদের। সারাদিন পিপুলগাছের তলায় গান গাওয়ার পর অবসন্ন দেহে বাপের হাত ধরে দোচালা ঘরখানিতে ফিরে রান্না চাপায় ছিবলি। তখন বাজারের অনেকেই আসে। বিষুণ আসে, হরকিষেণ আসে, মতিয়া আসে, চতুর্ভুজ আসে, জগনলাল আসে। এরাই ছিবলির পৃষ্ঠপোষক তথা রক্ষক।

সবাই এসে অন্ধ ধনপতের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। সুখদুঃখের গল্প, বাজার দরের তেজিমন্দির গল্প, এবার ফসল কেমন হল তার গল্প, ছিবলিদের রোজগার কেমন চলছে তার গল্প।

ছিবলির রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা গল্প করে। তারপর ভাত বেড়ে অথবা থালায় রুটি সাজিয়ে ছিবলি যখন বাপকে খেতে ডাকে তখন আসর ভাঙে। যারা গল্প করতে আসে তারা বলে, 'তোমরা এখন খাও, আমরা চলি।'

'আচ্ছা।' ধনপত মাথা নাড়ে।

প্রতিদিনই যাবার সময় তারা বলে, 'যদি কোন দরকার হয় আমাদের বলবে।'

'জরুর।'

'লজ্জা করো না যেন।'

'তোমাদের কাছে আবার লজ্জা! তোমাদের ভরসাতেই তো এখানে আছি।'

ধনমানিকপুরে এসে মোটামুটি ভালই আছে ছিবলি। তবে একটা সংশয় সর্বক্ষণ ছায়ার মত তার পিছু হাঁটছে। নাকি সেটা

অস্বস্তি ? অস্বস্তিই যদি হয় বুকের ভেতর খচখচ করে অবিরত সেটা বেজে চলেছে।

যেখানেই যাক ছিবলি, নওলকিশোরের কোয়ার্টারে কিংবা দূরে কোন আমোদ প্রমোদের আসরে গান গাইতে, অথবা যার সঙ্গে যেখানেই কথা বলুক—চলতে-ফিরতে-উঠতে-বসতে যখনই ছিবলি চোখ ফেরায়, দেখতে পায় প্রথম দিনের সেই ঢ্যাঙা, বাজে পোড়া তালগাছের মত লোকটা নির্নিমেষে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। প্রথম দিনের মতই তার দু-চোখে অপার অসীম বিস্ময়।

দু বছর ধরে ঐ লোকটার চোখ নিয়ত পিছু পিছু ঘুরছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, ধনমানিকপুরের সবাই এসে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করে গেছে কিন্তু ঐ লোকটা আসে নি। একটা কথাও বলে নি সে ; দূর থেকে সে শুধু তাকিয়েই থাকে।

প্রথম প্রথম ভীষণ ভয় করত ছিবলির ; বুক কাঁপত। ইদানীং ভয়টা কেটেছে কিন্তু সংশয় এবং অস্বস্তি আছে। তবে সেই সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছে। পিপুলগাছের তলায় গাইতে গাইতে কিংবা পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই লোকটাকে দেখা তারও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকাল তাকে না দেখলে ভাল লাগে না ছিবলির ; কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়।

কী উদ্দেশ্যে দু বছর ধরে লোকটা তাকিয়ে আছে, বোঝা যায় নি। তবে ইতিমধ্যে তার পরিচয় জেনে ফেলেছে ছিবলি। ওর নাম ফুলনরাম।

একটা মানুষ দু বছর ধরে নিয়ত তাকিয়ে আছে ; কাজেই তার সম্বন্ধে কৌতূহল না হয়ে পারে নি ছিবলির। খবর নিয়ে সে জেনেছে ফুলনরাম এ অঞ্চলের মানুষ না, ছিবলিদের মতই ভাসতে ভাসতে ধনমানিকপুরে এসে ঠেকেছে। এখানে ট্রেন যাত্রীদের মোটঘাট বয় ফুলনরাম, মাঝে মাঝে কাঁচা আনাজ কি পান বিড়ির দোকান খুলে বসে। নির্দিষ্ট কোন জীবিকা নেই ফুলনরামের ; প্রাণধারণের

জন্য তার নানা রকমের উঞ্ছবৃত্তি। জগৎ-সংসারে ফুলনরামের আপন বলে কেউ আছে কিনা কেউ জানে না।

তিন

দু বছর ধরে ছিবলি দেখে আসছে ধান গমের মরসুমের সময় ধনমানিকপুরের চেহারাটাই পুরোপুরি বদলে যায়। বিকিকিনি দবাদবিতে তখন জায়গাটা সর্বক্ষণ সরগরম। অসংখ্য মানুষে, বয়েল আর মোষের গাড়িতে ধনমানিকপুর জমজমাট হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের ধমনী তখন অতি মাত্রায় চঞ্চল।

মরসুমের আরো একটা দিক আছে। এত মানুষের যখন আনাগোনা তখন সুযোগ বুঝে ভিনদেশী দোকানদারেরা এসে তাদের মনোহরণ পসরা মেলে বসে। এক আধটা সার্কাসের দল আসে, মাদারী খেলোয়াড়রা আসে। চোর-জুয়োচোর-পকেটমার—কারো আসতেই আর বাকি থাকে না।

ছিবলিরা আসার পর দু বছর পার হয়ে এবার তৃতীয় বছরের মরসুম শুরু হল। সবে অঘ্রানের মাঝামাঝি; এখনও ভাল করে মরসুম জমে ওঠে নি। কিন্তু এরই ভেতর সার্কাস-মাদারী খেল-ভেলকিবাজি এসে হাজিরা দিয়েছে। প্রতি বছরই এরা আসে; এদের আসায় তেমন বিশেষত্ব নেই।

এ মরসুমের সব চাইতে বড় আকর্ষণ হচ্ছে একটা নৌটঙ্কীর দল; দলটা এ বছরই নতুন ধনমানিকপুরে এসেছে।

নৌটঙ্কী জিনিসটা চেহারায় এবং চরিত্রে বাঙলা দেশের যাত্রাপালার সহোদর। পৌরাণিক একটি পালাকে ঘিরে প্রচুর নাচ, প্রচুরতর গান, চড়াসুরের অভিনয় এবং ভাঁড়ামি—চতুরঙ্গে জনতার মনোরঞ্জন করা হয়।

নৌটঙ্কীর দলগুলো ভ্রাম্যমাণ ; সারা উত্তর ভারতে এরা বয়েল গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যেখানে মেলা বসে, যেখানে যেখানে ধানগমের মরসুম শুরু হয় সেখানেই তারা হাজিরা দেয়। এদের ডাকতে হয় না ; নিমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই! রবাহূতের মত তারা নিজেরাই ছুটে আসে। তারপর তাঁবু খাটিয়ে আসর বসিয়ে রসে রঙ্গে দেহাতী মানুষকে মাতিয়ে নিজেদের পাওনা বুঝে নেয়।

যাই হোক মরসুমের সময়টা ছিবলির ব্যস্ততা বাড়ে। গান বাজনা যখন তার জীবিকা, তার ব্যবসা, তখন সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। নওলকিশোরের কাছে গিয়ে রেকর্ডের নতুন গান শিখে আসে ; পুরনো গানগুলো মেজে ঘষে তালিম দিয়ে আগে থেকেই ঠিক করে রাখে। মরসুমের দিনগুলোতে প্রমোদের কত উপকরণই তো আসে ধনমানিকপুরে। সবার চাইতে বেশি মনোরঞ্জন করে সব চাইতে বেশি রোজগারই ছিবলির একমাত্র ধ্যান জ্ঞান।

এই সময়টা প্রচুর সাজে ছিবলি। গান বাজনার সঙ্গে কিছু ছলাকলা মেশাতে পারলে উপার্জন ভালই হয় ; ওটা ব্যাবসারই অঙ্গ।

দেখতে দেখতে এ বছরের মরসুম জমে উঠল।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সাজতে বসল ছিবলি। সোনালী একটা ঘাঘরা পরেছে সে ; কাঁচুলিটা উগ্র লাল রঙের। চুল পরিপাটি একটি খোঁপায় চুড়ো করে বাঁধা। চোখে দীর্ঘ রেখায় কাজলের টান ; হাতে পায়ে মেহেদির সুচারু চিত্র। দুই ভুরুর মাঝখানে তৃতীয়ার চাঁদের মত হলুদ টিপ।

দু বছর আগে ছিবলিকে যারা দেখেছে আজ হঠাৎ দেখলে তাকে চিনে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। যে জোয়ারটা তার দুয়ারে এসে থমকে ছিল এই দু বছরে কানায় কানায় তা তাকে ভরে দিয়েছে।

যাই হোক সেজেগুজে মোহিনী হয়ে বাপের হাত ধরে পিপুল

গাছের তলায় এসে গাইতে বসল ছিবলি। রামচরিতের পদগুলোই বেশি গায় সে ; তবে এই মরসুমের সময়টা আশুতোষ শ্রোতাদের জন্য চটুল রসের তরল রসের গান ধরে। রেকর্ড থেকে শেখা একটা গান সে আজ গাইছিল—

'পত্‌লী কোমরি হায়, তিরছি নজরী হায়—
মেরে লাল দোপাট্টা মলমল উড়ি যায়।'

গান ধরতে ধরতেই জমিয়ে ফেলল ছিবলি। বেলা যত বাড়তে লাগল তার চারপাশে ভিড়ও বাড়তে লাগল। পয়সাও পড়ছে অজস্র। মরসুমের সময়টা ধনমানিকপুরে কাঁচা পয়সা যেন হাওয়ায় উড়তে থাকে। তার থেকে এক আধ মুঠো ছিবলির আঁচলে ছুঁড়ে দিতে কারো আপত্তি নেই।

একটানা অনেকক্ষণ গাইবার পর জিরোবার জন্য হারমোনিয়াম-খানা গলা থেকে খুলে নামিয়ে রাখতে যাবে সেই সময় একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল। নিখুঁত কামানো মুখে মোমে মাজা শৌখিন গোঁফ ; তার প্রান্তদুটো সযত্নে পাকানো। পরনে উত্তর প্রদেশীয় চুস্ত এবং কলিদার পাঞ্জাবি। পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। দু হাতের পাঁচটা আংটি আর জামার বোতাম থেকে জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে। সর্বাঙ্গ আতরে ভুরভুর।

লোকটা মাথা নেড়ে তারিফের ভঙ্গিতে বলল, 'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। তোমার গলা চমৎকার ; গান শুনে দিল আমার খুসবুতে ভরে গেছে। তা তোমার নাম কী ?'

প্রশংসায় চোখ নত হল ছিবলির। খুশী সে হয়েছিল ঠিকই তবে এমন একজন রইস লোককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হকচকিয়েও গেছে। কাঁপা গলায় বলল, 'আমার নাম ছিবলি।'

লোকটা বলল, 'আমার নাম কামেশ্বর শর্মা। তোমাদের এখানে একটা নৌটঙ্কীর দল এসেছে দেখেছ ? ঐ যে ওখানে তাঁবু পড়েছে—' বলে ধনমানিকপুর গঞ্জের দক্ষিণে অঙুল বাড়িয়ে দিল।

'হাঁ-হাঁ—' আগ্রহে চোখদুটি চকচক করে উঠল ছিবলির।

পাশ থেকে অন্ধ ধনপত বলে উঠল, 'আমিও শুনেছি।'

কামেশ্বর বলল, 'আমি ঐ দলটার মালিক।'

ছিবলির আর ধনপতের মুখেচোখে সম্ভ্রম ফুটে বেরুল। কামেশ্বরকে কোথায় বসাবে, কিভাবে খাতির করবে ভেবে পেল না।

তাদের ব্যস্ততা দেখে কামেশ্বর বলল, 'আমার জন্যে তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না।' ছিবলির চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, 'তোমার কে কে আছে?'

অন্ধ ধনপতকে দেখিয়ে ছিবলি বলল, 'এই আমার বাবা। বাবা ছাড়া আর কেউ নেই আমার।'

'ভাই-বোন-মা, কেউ না?'

'না।'

কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে কি ভাবল কামেশ্বর। তারপর বলল, 'কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। নিরিবিলি জায়গা পেলে ভাল হয়।'

ধনপত শুধলো, 'কী কথা বলবেন?'

'এখানে এই হাটের মাঝখানে বলার অসুবিধে আছে।'

'তা হলে একটা কাজ করতে হবে আপনাকে।'

'কী?'

'একটু কষ্ট করে কাল সকালবেলায় একবার গরীবখানায় আসতে হবে।'

'জরুর যাব।'

'বেশি দেরি করবেন না যেন, একটু বেলা হলে আমরা কিন্তু বেরিয়ে পড়ি।'

'তাড়াতাড়িই যাব। তা তোমরা থাকো কোথায়?'

ছিবলির বাপ তাদের ঠিকানা বলল এবং কিভাবে সেখানে পৌঁছুতে হবে তা-ও জানিয়ে দিল।

কামেশ্বর বলল, 'তা হলে এখন চলি ; কাল আবার দেখা হচ্ছে।'

'আচ্ছা।'

বিদায় নিয়ে কামেশ্বর শর্মা চলে গেল।

কাল এসে লোকটা কী বলবে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। খানিক দুর্ভাবনায় খানিক সংশয়ে ছিবলি বলল, 'আমাদের কাছে নৌটঙ্কীর দলের মালিকেব কী দরকার?'

ধনপত বলল, 'কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

আর কোন প্রশ্ন করল না ছিবলি ; তাকে খুবই চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে। চোখ নামিয়ে অন্যমনস্কের মত নখ খুঁটে যেতে লাগল সে। এই মুহূর্তে মনের ভেতর ঘূর্ণির মত কি যেন পাক খেয়ে চলেছে। ভাবনার ঘোরে একসময় মুখ তুলতেই চোখে পড়ল, সেই লোকটা—সেই ফুলনবাম—নির্নিমেষে তাব দিকেই তাকিয়ে আছে।

কথামত পরের দিন রোদ উঠবার আগেই কামেশ্বর শর্মা ছিবলিদের দোচালা ঘরখানায় এসে হাজির। তাকে সাদরে সসম্ভ্রমে ধবধবে একখানা চাদর পেতে বসাল ছিবলি।

বসেই কামেশ্বর বলল, 'দেখ, বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারব না ; তোমাদের নষ্ট করবার মত বেশি সময় নিশ্চয়ই নেই।'

ছিবলি বলল, 'সত্যিই তা নেই।'

'তা হলে কাজের কথাটা সেরে ফেলি।'

ধনপত এইসময় বলে উঠল, 'তার আগে থোড়াসে চা—'

বাধা দিয়ে কামেশ্বর বলল, 'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার কথায় রাজী হলে চা পরে অনেক খাওয়া যাবে।'

ছিবলি বলল, 'যে জন্যে এসেছেন বলুন—'

আসল প্রসঙ্গে যাবার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছিবলিদের জীবিকা, দৈনিক আয়, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে নিল কামেশ্বর। অবশেষে সামান্য ভূমিকার পর নিজের প্রস্তাব পেশ করল।

প্রস্তাবটা সংক্ষেপে এইরকম। ছিবলির মত খাঁটি হীরে পথের ধুলোয় পড়ে থাকবে এটা কোন কাজের কথা নয়। তার মত গুণীর জন্য যে কোন রাজা-বাদশা নাকি সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারে। গঞ্জের কোণে পিপুল গাছের তলা তার যোগ্য স্থান না। আজে-বাজে ইতর জনতার কাছে গলা ফাটিয়ে নিজেকে নষ্ট করে দেওয়া শুধু অনুচিতই না, অন্যায়ও।

কামেশ্বর শর্মা ছিবলিকে সিংহাসন যোগাড় করে দিতে পারবে না ঠিকই তবে তার প্রতিভা যাতে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করে দেবে। কামেশ্বরের ইচ্ছা ছিবলি নৌটঙ্কীর দলে আসুক; সে তাকে মাথায় করে রাখবে। ছিবলির যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষ কিছুই দিতে পারবে না কামেশ্বর। তবে এখনকার উপার্জনের চাইতে বেশিই দেবে।

সব শুনে ছিবলি বলেছিল, 'আপনার দলে গেলে কত দেবেন?'

'আশী টাকা। তা ছাড়া খোরাক পোশাক।'

আশী টাকা; তার ওপর খাওয়া-পরা! ছিবলি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। জীবনে কোনদিন একসঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি সে ছাখে নি। কামেশ্বরের কথার উত্তরে কি বলা উচিত ছিবলি বুঝে উঠতে পারছিল না।

কামেশ্বর বলল, 'কি, রাজী?'

ছিবলি কিছু বলার আগে সাগ্রহ কাঁপা গলায় ধনপত বলে উঠল, 'হাঁ-হাঁ রাজী বাবুজী; হাজারবার রাজী।'

ছিবলি বলল, 'তুমি চুপ করো তো বাবা।' কামেশ্বরকে বলল, 'আমার আরো ক'টা কথা আছে বাবুজী। রাজী কি অরাজী তারপর বলব।'

কামেশ্বর বলল, 'জরুর। রাজী হওয়া কি অরাজী হওয়া পরের কথা। আগে মন খোলসা করে তোমার যা বলবার বল; আমি জবাব দিতে চেষ্টা করি। আগে তেতো পরে মিঠা হওয়া ভাল।

তাতে সম্পর্কটা টেকসই হয়। না কি বল ?'

ছিবলি মাথা নেড়ে সায় দিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

কামেশ্বরের ধৈর্য খুব কম নয়। সে তাড়া দিয়ে উঠল, 'কি, মুখ বুজে কেন ? যা বলতে চাও বলে ফেল। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

ছিবলি বলল, 'আপনি তো আমাকে দলে নিতে চাইছেন। লেকেন—'

'কী ?'

'আমার বাবা অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। এক পা যেতে হলে হাত ধরতে হয়। আমি ছাড়া বাবাকে দেখবার শুনবার কেউ নেই। আমি আপনার দলে চলে গেলে বাবাকে কে দেখবে ?'

ছিবলির ইঙ্গিতটার ভেতর কোনরকম অস্পষ্টতা নেই। কামেশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কি আশ্চর্য, তোমাকে নিয়ে যাব আর ঐ অন্ধ লোকটাকে ফেলে রেখে যাব। আমাকে কী ভাব ? আদমী না জানোয়ার ? তোমার বাবার দায়িত্ব আমার।'

ছিবলি অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। গাঢ় কৃতজ্ঞ স্বরে বলল, 'আপনার কির্‌পা।'

বিব্রত হবার ভঙ্গি করে কামেশ্বর বলল, 'কির্‌পা টির্‌পা কিছু না ; ও-সব বলে লজ্জা দিও না। আর কিছু বলবার আছে তোমার ?'

'একটা মাত্র কথা।'

'বল।'

'আপনার দলে গেলে আমরা থাকব কোথায় ?'

কামেশ্বর হেসে ফেলল।

ছিবলি বলল, 'হাসলেন যে !'

'হাসার কথা বললে যে। আমার দলে আসছ ; থাকবে আর কোথায় ; আমাদের সঙ্গেই থাকবে। নৌটঙ্কী দলের রীতিনীতি জানো ?'

'ভাল করে কিছু জানি না।'

'আমরা সারা বছর এখানে-ওখানে মেলায়-মেলায়, হাটে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াই। বয়েল গাড়ি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই। কোথাও এলে তাঁবু পেতে নিই। চলবার সময় তোমাদের বাপবেটিকে একটা বয়েল গাড়ি দেওয়া হবে; যখন থামব একটা তাঁবু পাবে। কি, অসুবিধে হবে?'

'জী, না।'

একটু ভেবে কামেশ্বর এবার পকেট থেকে এক গোছা দশ টাকার নোট বার করে আটখানা গুনে নিল। ছিবলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও—'

জিজ্ঞাসু বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল ছিবলি। হঠাৎ এতগুলো টাকা কামেশ্বর কেন তাকে দিতে চাইছে বুঝতে পারল না।

কামেশ্বরই এবার বুঝিয়ে দিল, 'আশী টাকা আছে; তোমার এক মাসের মাইনে আগাম দিলাম। নাও—'

একসঙ্গে আশীটা টাকা! হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ছিবলি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার মতন মানুষের পক্ষে এতগুলো টাকার প্রলোভন জয় করা অসম্ভব ব্যাপার। কি করবে ভেবে পেল না ছিবলি।

কামেশ্বর বলল, 'কি হল, ধর। তারপর মালপত্র যা আছে সব বেঁধে ছেঁদে তুমি আর তোমার বাপ আমার ওখানে চল।'

'আজই?'

'আজই কি, এখনই। আমি তোমাকে নিতে এসেছি; সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা ভাবনা ছিবলির সত্তার মধ্য দিয়ে দুরন্ত বেগে বয়ে গেল। জানা নেই শোনা নেই, কামেশ্বরের কোন কাজও করে নি, তবু আগেই এতগুলো টাকা কেন দিতে চাইছে লোকটা? এ কোন ফাঁদ নয় তো? কামেশ্বরের মনে অন্য

কোন অভিসন্ধি যে নেই তার প্রমাণ কী ?

ভাবতে ভাবতে নিজের দিকে চোখ ফেরাল ছিবলি। সর্বাঙ্গ ঘিরে অপরিমিত যৌবন একেবারে উদ্দাম হয়ে আছে। কোথাও এতটুকু অপূর্ণতা নেই। সব ছাপিয়ে সব ভাসিয়ে চারদিকে একেবারে ঢল নামিয়ে দিয়েছে।

নিজেকে দেখতে দেখতে শিউরে উঠল, ছিবলি। এই দেহটার জন্য, এই অজস্র উচ্ছ্বসিত যৌবনের জন্যই কি খাওয়া-পরা-টাকা ইত্যাদির ছদ্মবেশে মরণফাঁদ পাততে চাইছে কামেশ্বর ?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ছিবলি বলল, 'একটা কথা বাবুজী—'

কামেশ্বর তাকিয়েই ছিল। বলল, 'বল।'

'টাকাটা এখন নেব না।'

কামেশ্বর অবাক। সে ভেবেছিল এই পথের মেয়েটাকে আশী টাকার টোপ ঝুলিয়ে নিমেষে শিকার করে ফেলবে। কিন্তু তাকে যতখানি সহজলভ্যা মনে হয়েছিল আসলে সে ততখানি সস্তা নয়।

কামেশ্বর বলল, 'তবে কি পরে নেবে ?'

অস্ফুটে ছিবলি কি বলল, বোঝা গেল না।

টাকাগুলো আবার পকেটে পুরতে পুরতে কামেশ্বর বলল, 'বেশ, মাসকাবারেই নিও। তবে আর দেরি কোরো না; জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চল।'

'না।'

'না কেন ?'

'আমাকে দু'দিন ভাবতে দিন বাবুজী।'

'এর ভেতর ভাবাভাবির কি আছে ?'

'আছে।'

কামেশ্বর কি বুঝল সে-ই জানে। নিজের মনগড়া ধারণা থেকে বলল, 'তুমি মাইনে আরো বেশি চাইছ নাকি ?'

আবার সেই টাকার প্রলোভন! ছিবলি বলল, 'না-না, তা নয়।'

'তবে ?'

'সে অন্য ব্যাপার।'

'আহা, আমার কাছে বলই না।'

একটু চুপ করে রইল ছিবলি। তারপর বলল, 'সে কথা শুনে আপনার কিছু লাভ হবে না বাবুজী।'

কামেশ্বর বুঝল আর পীড়াপীড়ি বৃথা ; মেয়েটা এ প্রসঙ্গে একেবারেই মুখ খুলবে না। প্রথমেই বেশি ব্যগ্রতা দেখালে অথবা টানাটানি করলে লোকসানের সম্ভাবনাই ষোল আনা। কামেশ্বর অভিজ্ঞ ব্যবসাদার মানুষ, কোথায় রাশ টানতে হয় সে কৌশল তার জানা। সে বলল, 'বেশ দু দিন তাহলে ভেবেই নাও। আমরা তো এখন ধনমানিকপুরে আছি। দু দিন পরে এই সকালের দিকে আবার আসব। আজ চলি।'

'আচ্ছা।'

কামেশ্বর শর্মা চলে গেল।

নৌটঙ্কীর দলে যাবে কি যাবে না, দুটো দিন সমানে ভেবে গেল ছিবলি কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না। পারল না বলে সীমাহীন অস্বস্তির ভেতর তার সমস্ত সত্তা অস্থির হয়ে রইল।

কথামত দু দিন পর কামেশ্বর এসে হাজির। বিনা ভূমিকায় সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কী ঠিক করলে ?'

কুণ্ঠিত সুরে ছিবলি বলল, 'আমাকে আর ক'টা দিন সময় দিতে হবে বাবুজী।'

'এখনও আর ক'টা দিন !'

'জী।'

'বেশ। ক'দিন পর আসব বল ?'

'আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না ; আমিই আপনার কাছে যাব।'

'না-না, আমিই আসব। এখান থেকে এখানে, কষ্ট আর কি।'

ছিবলি বলতে পারত, এখান থেকে যখন এখানে, তখন অনায়াসে সে-ও যেতে পারে। সে কথা অবশ্য বলল না।

কামেশ্বর বলল, 'দিন তিনেক পরে আসব?'

খানিক ইতস্তত করে ছিবলি বলল, 'তবে তাই আসুন।'

আরো তিনটে দিন সময় পেয়েছে ছিবলি। সে শুধু ভাবল, ভাবল আর ভাবল। ভাবতে ভাবতে অতর্কিতে নওলকিশোরের কথা মনে পড়ে গেল। তাই তো, হাতের কাছে এমন একজন শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে সে ভেবে মরছে কেন? তাঁর কাছে সব খুলে বলে মতামত চাইলেই তো হয়। নিশ্চয়ই নওলকিশোর সঠিক পরামর্শই দেবেন।

নওলকিশোরের কথা মনে পড়তে আর দেরি করল না ছিবলি; স্টেশনের দিকে ছুটল।

নওলকিশোর স্টেশনে ছিলেন না, কোয়ার্টারে গেছেন। সেখানেই চলে গেল ছিবলি। এতটা পথ ছুটে এসেছে; ছিবলি হাঁপাতে লাগল।

একটু অবাক হয়ে নওলকিশোর বললেন, 'কি রে, অমন হাঁপাতে হাঁপাতে আর ছুটতে ছুটতে আসছিস যে?'

ছিবলি বলল, 'বড় ভাবনায় পড়েছি মাস্টারজী।'

'তোর আবার কিসের ভাবনা?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নওলকিশোর তাকালেন।

কামেশ্বরের প্রস্তাব সম্বন্ধে সব কথা জানিয়ে ছিবলি বলল, 'এখন আপনি বলুন নৌটঙ্কীর দলে যাব কি যাব না।'

নওলকিশোর উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'জীবনে এমন সুযোগ দুবার আসে না। যাবি বৈকি নৌটঙ্কীর দলে, নিশ্চয়ই যাবি।'

'উঁহু— 'জোরে জোরে মাথা নাড়ল ছিবলি।

'কী হল?'

'হুম করে বললে হবে না, ভেবে চিন্তে বলুন মাস্টারজী। আপনি ছাড়া পরামর্শ করার আর কেউ নেই আমার।'

নওলকিশোর বললেন, 'এর ভেতর চিন্তা-ভাবনার কিচ্ছু নেই।

নৌটঙ্কীর দলে তোকে যেতেই হবে। ধনমানিকপুরে পিপলা গাছের তলায় বসে গলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে সারা জীওন চলবে না। এখানে ক' পয়সা আর তোর রোজগার ; নৌটঙ্কীর দলে গেলে অনেক পয়সা পাবি। তা ছাড়া আরো ক'টা দিক আছে।'

'কী দিক ?'

'ওখানে গেলে বড় হতে পারবি ; নাম ছড়িয়ে পড়বে তোর ; কত লোকে তোকে চিনবে, খাতির করবে। ধনমানিকপুরে বসে থাকলে এসব কোত্থেকে হবে ?'

'আপনি যা বললেন তা আমি ভেবে দেখেছি মাস্টারজী। লেকেন—'

'কী ?'

'আরো কথা আছে।'

ছিবলি কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে নওলকিশোর তাকিয়ে রইলেন।

ছিবলি বলল, 'কথাটা হচ্ছে আমি তো ওদের চিনি না ; কী মতলব ওদের তা-ও জানি না। আমার বয়েস কম। লোভ দেখিয়ে কোন ফাঁদে নিয়ে ফেলবে কিনা কে জানে। হয়ত আমার সর্বনাশ করে ফেলবে।' বলতে বলতে চোখ নামাল ছিবলি।

নওলকিশোর খানিক চকিত হলেন ; ছিবলির এই কথাটা তিনি ভেবে ছাখেন নি। ছিবলির নাম হবে, খ্যাতি হবে, পয়সা হবে, লোকে ছিবলিকে খাতির করবে, অসংখ্য মানুষের স্নেহ এবং প্রীতি তাকে নিয়ত ঘিরে থাকবে—এই ভাবনাটাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নৌটঙ্কীর দলে গেলে অন্য আরেকটি ভয়াবহ সম্ভাবনা যে থাকতে পারে তা ভেবে ছাখেন নি নওলকিশোর। ধীরে ধীরে চিন্তিত সুরে তিনি বললেন, 'এ একটা কথা বটে।'

'এখন বলুন আমি কী করব।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না নওলকিশোর। খানিকক্ষণ চুপ করে

থেকে বললেন, 'আমি কামেশ্বরের সঙ্গে একটু কথা বলি ; তারপর বলব।'

'আচ্ছা।'

নওলকিশোর বললেন, 'এক কাজ করলে হয় না ?'

ছিবলি বলল, 'কী ?'

'নৌটঙ্কীর গান তো হয সন্ধ্যেবেলা।'

'জা।'

'সে সময়টা ওরা খুব ব্যস্ত থাকে। ভাবছি দুপুরবেলা ওদের তাঁবুতে গিযে কামেশ্বরের সঙ্গে দেখা করব। তুইও যাবি আমার সঙ্গে।'

'আচ্ছা।'

দুপুরবেলা নৌটঙ্কীর দলের তাঁবুগুলোর কাছে এসে খোঁজ করে কামেশ্ববকে বার করলেন নওলকিশোর। নিজের পরিচয় দিতে কামেশ্বর খাতির করে তাঁকে বসাল। ছিবলিকেও প্রচুর খাতির কবল। অবশেষে নওলকিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফরমাইয়ে—'

নওলকিশোর বললেন, 'আপনার কাছে বিশেষ একটা দরকারে এসেছি।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে কামেশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কথা জরুর হবে, তার আগে বলুন কী চলবে, চা না কফি ?'

'এখন ওসব থাক।'

'উঁহু, কিরূপা করে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন একটু কিছু মুখে দিতেই হবে।'

কিছুটা অনিচ্ছার সুরে নওলকিশোর বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছে আনান।'

একটু পর চা এল ; সঙ্গে কিছু বিস্কুট এবং লাড্ডু। চায়ে চুমুক দিয়ে কামেশ্বর বলল, 'এবার আপনার দরকারের কথাটা বলুন।'

ছিবলিকে দেখিয়ে নওলকিশোর বললেন, 'এই মেয়েটাকে আপনি আপনার দলে নিতে চাইছেন ?'

'জী।' কামেশ্বর মাথা নাড়ল, 'আশী টাকা মাইনে দেব, খোরাক-পোশাক দেব, ওর অন্ধ বাপের দায়িত্ব—'

বাধা দিয়ে নওলকিশোর বললেন, 'সে সব আমি শুনেছি। আপনি যা-যা সুযোগ সুবিধে দিতে চেয়েছেন তাতে ওর কিছুমাত্র আপত্তি নেই ; বরং এতটা ও আশাই করতে পারে না।'

কামেশ্বর প্রথমে কোন মন্তব্য করল না। ছোট ছোট চুমুকে চায়ের কাপটা শেষ করে সরাসরি নওলকিশোরের দিকে তাকাল, 'আপত্তি নেই তবে দলে আসতে টালবাহানা করছে কেন ?'

'ভয়ে।'

'ভয়ে !'

'জী।' নওলকিশোর খুব আস্তে মাথা নাড়লেন, 'আমার সঙ্গে ওর এমনিতে কোন সম্পর্ক নেই ; তবু ও আমার মেয়ের মত। আমাকে না জানিয়ে কোন কাজই ও করে না। আপনি দলে নিতে চাইছেন আমার কাছে তাই ও ছুটে গেছে পরামর্শের জন্যে। মাইনে কি অন্য সুযোগ-সুবিধে যা দিতে চেয়েছেন তাতে ও খুশি। লেকেন ভয়টা কিছুতেই যাচ্ছে না। তাই আপনার দলে গিয়ে লাভ হবে বুঝতে পেরেও যেতে পারছে না।'

'ভয়টা কিসের ?'

নওলকিশোর বললেন, 'ছিবলির কাঁচা বয়েস ; এই বয়েসের মেয়েরা সব চাইতে যে ভয়টা বেশী করে সেই ভয়।'

স্থির দৃষ্টিতে এক পলক ছিবলির দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল কামেশ্বর। খুব আস্তে বলল, 'বুঝেছি।'

নওলকিশোর বলতে লাগলেন, 'কোনদিন মেয়েটা নৌটঙ্কীর দলে-টলে ঘোরে নি ; ওখানকার জীবনযাত্রা কেমন তা জানে না। জানে না বলেই ওর যত ভয়।'

খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল কামেশ্বর। এবার বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি মাস্টারজী।'

'বলুন—'

'ঐ বয়েসের মেয়ের পক্ষে দুনিয়ার কোন জায়গাই নিরাপদ নয়। নিজে যদি ঠিক থাকে নরকে গেলেও কেউ তাকে পাঁক মাখাতে পারবে না। আর নিজের চাল যদি বেঠিক হয় সিন্দুকে পুরে রাখলেই বা কি।'

'ঠিক কথা।'

'আগেই বলে রাখছি মাস্টারজী, আমার দল ভাল জায়গা নয়। মেলায়-মেলায়, বাজারে-গঞ্জে আমাদের ঘুরে বেড়াতে হয়; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। ছিবলি যদি না বেগড়ায় তা হলেই হল। কেউ যদি ওর পেছনে লাগে, তা যদি ওর পছন্দ না হয় আর আমাকে বলে, জরুর আমি তাকে ঠাণ্ডা করব।'

'ব্যস ব্যস, তা হলেই হল।'

'তবে—'

'কী ?'

'না ডাকলে আমি কারো ব্যাপারে মাথা ঢোকাতে চাই না। এই দেখুন না, আমার দলে পাঁচটা মেয়ে আছে। তাদের সবাই খারাপ নয়। একটা মেয়ে চম্পী তো খুবই ভাল। গেল সালে আমার দলের তবলচি তার পেছনে লাগল; চম্পী এসে আমায় বললে। তবলচিকে সেদিনই আমি দূর করে দিলাম। তবে তবলচির সঙ্গে ও যদি ঢলাঢলি মাখামাখি করতে চাইত আমি কিছু বলতাম না। যে যা খুশি করুক আমার আপত্তি নেই।'

'আপনি আমায় নিশ্চিন্ত করলেন শর্মাজী; ও আপনার দলে যাবে।'

সেদিনই অবশ্য না কিংবা তার পরের দিনও নয়, মরসুমের শেষে কামেশ্বররা যখন ধনমানিকপুর থেকে তাঁবু তুলল সেই সময় নৌটঙ্কীর

দলে নাম লিখিয়ে বাপের হাত ধরে তাদের বয়েল গাড়িতে গিয়ে উঠল ছিবলি। দু-বছর আগে ধনমানিকপুরে এসে এখানকার মাটিতে শিকড় মেলে দিয়েছিল সে; মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত জীবন পেয়ে খুশি হয়েছিল। খোরাক-পোশাক আর আশী টাকার টোপ চোখের সামনে ধরে শিকড় ছিঁড়ে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল কামেশ্বর শর্মা।

ছিবলিকে বিদায় দিতে ধনমানিকপুরের সবাই এসেছিল; এমন কি নওলকিশোরও এসেছিলেন। গাড়িতে উঠবার আগে ছিবলি প্রণাম করেছিল নওলকিশোরকে।

নওলকিশোর তার মাথায় হাত রেখে গাঢ় ভারী গলায় বলেছিলেন, 'ভগোয়ান তোর ভাল করুন।'

এই নিঃসঙ্গ উদাসীন আধেক-জানা আধেক-না-জানা মানুষটির কাছে দু বছর শুধু পেয়েছেই ছিবলি। বিদায় মুহূর্তেও তাঁর স্নেহ স্পর্শময় হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। কিছু একটা বলতে চেয়েছে ছিবলি; পারে নি। বুকের ভেতর থেকে কতকগুলো ঢেউ উঠে এসে স্বরটাকে বুজিয়ে দিয়েছে।

নৌটঙ্কী দলের বয়েল গাড়িগুলো একসময় মিছিল করে চলতে শুরু করল। ধনমানিকপুর গঞ্জটা ক্রমশ দূরে সরে সরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

উদাস চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দু-বছরের স্মৃতিজড়ানো গঞ্জটাকে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছিল ছিবলি। সারা জীবন সে শুধু ঘুরছেই; আর্যাবর্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হন্যে হয়ে ঘুরছে। কোন জায়গাই তার প্রাণে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি; কিন্তু এই ধনমানিকপুরের কথা আলাদা। এই জায়গাটার ওপর তার মায়া পড়ে গেছে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ ছিবলির চোখে পড়ল, বয়েল গাড়িগুলো থেকে খানিকদূরে প্রথম দিনের সেই লোকটা—সেই ফুলনরাম। কাঁধে একটা ঝুলি ছাড়া কিছু নেই। প্রান্তর ফুঁড়ে লোকটা যেন বিপুল বিস্ময়ের মত উঠে এসেছে।

স্থির নিষ্পলকে তাকিয়েই রইল ছিবলি। এদিকে উত্তর বিহারের রক্তাভ প্রান্তরে বয়েল গাড়িগুলো কত পথ পাড়ি দিল, কত বাঁক ঘুরল তার হিসেব নেই। কিন্তু ফুলরাম আসছেই, আসছেই।

॥ চার ॥

এর পর নৌটঙ্কীর দলে এক বিচিত্র ভ্রাম্যমান জীবন শুরু হল ছিবলির।

অবশ্য জ্ঞান হবার পর থেকেই ছিবলি ঘুরছে। কোথায় উত্তর প্রদেশের রুক্ষ লাল প্রান্তর, কোথায় ইলাহাবাদ, নৈনী, মীরজাপুর, বনারস আর কোথায় বিহারের চম্পারন জেলা, আরা জেলা, মজঃফরপুর, সারণ জেলা! সে শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটেছে। ধনমানিকপুর ছাড়া কোথাও পা পেতে বসার সময় তার হয় নি। পেট নামে অবুঝ দাহটা তাকে অবিরত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

কিন্তু নৌটঙ্কীর দলের বয়েল গাড়িতে করে ঘোরাটা অন্যরকম। এ এক সুখপ্রদ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। ছিবলির মনে হয় এটা যেন সত্যি নয়, ঘুমঘোরে মনোরম এক স্বপ্নের ভেতর কেউ বুঝি তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে।

যাই হোক, কামেশ্বরের নৌটঙ্কী দলে মোট চোদ্দখানা বয়েল গাড়ি। গাড়িগুলো বাঁশের বাতা দিয়ে চারকোনা করে ছাওয়া; তলায় কাঠের পাটাতন। ফলে ঘরের আরাম তো আছেই। তার ওপর টিমে তালের দুলুনিও মেলে।

এক গাড়িতে থাকে মালিক কামেশ্বর শর্মা। অন্য গাড়িগুলো যথাক্রমে অভিনেতা-অভিনেত্রী-গায়ক-গায়িকা-বাজনদার-রান্নার লোক-সাজপোশাক এবং নানারকম সাজসরঞ্জামে ঠাসা। একটা গাড়ি দেওয়া হয়েছে ছিবলি আর তার বাপকে।

বেশ আরামদায়ক ব্যবস্থা; কাঠের পাটাতনে গদি পাতা। এমনিতে বয়েল গাড়ির ছইয়ের দু পাশ খোলা থাকে। কিন্তু এই

গাড়িগুলোতে খোলাধার ছুটো ঢেকে যাতায়াতের জন্য দরজা করা হয়েছে। গদি, তোষক, তাকিয়া, কাচের লণ্ঠন, যা-যা প্রয়োজন হাতের কাছে সব কিছুই রয়েছে। এমন কি সকালে-ত্নপুরে-রাত্রে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে খাবার আসছে। কামেশ্বর প্রায়ই এসে তাদের খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছে; কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জেনে যাচ্ছে। এত আরামে এমন অপরিমিত সুখে জীবনে আর কখনও থাকে নি ছিবলি।

ধনপত খুব খুশি। সে ডাকে 'ছিবলিয়া—'

ছিবলি সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'সারা জীওন অনেক কষ্ট করেছি। এবার বুঝি আমাদের সুখের দিন এল।'

'হাঁ।'

'শেষ জীওনটা মালুম হচ্ছে ভালই যাবে।'

ছিবলির বয়েস কম হলেও প্রাণধারণের জন্য নিয়ত তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে দেখে আসছে বাপ অন্ধ। অন্ধ বাপের দায়িত্ব সেদিন থেকেই তাকে নিতে হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে যাকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় সহজে তার অভিভূত হলে চলে না। কোন ব্যাপারেই খুব তাড়াতাড়ি বিচলিত হয় না ছিবলি, বিহ্বলও। জীবনযুদ্ধ তার উচ্ছ্বাসের তীব্রতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

ছিবলি বলে, 'ছাখো।'

'দেখব কি রে!' ধনপত বলে, 'দেখা আমার হয়ে গেছে। খাওয়ার ব্যবস্থা কত ভাল; মাংস দিচ্ছে রোজ, ত্নধ দিচ্ছে, ফল দিচ্ছে।'

ছিবলি হাসে, 'মাংস-ত্নধ পেটে পড়তে না পড়তেই গুণ গাইতে শুরু করলে!'

'করব না? এমন করে কেউ খাইয়েছে আগে? এত খাতির যত্ন কেউ কখনও করেছে?'

'ছাখো কদ্দিন এমন আরাম কপালে সয়।'

'তোর সব তাতে বাড়াবাড়ি।'

'বাড়াবাড়ি নয়।'

'তবে কী?'

'ছ্যাখো বাপু, আমাকে এরা চেহারা দেখবার জন্যে রাখে নি; কাজের জন্যে রেখেছে। আমি কোনদিন নৌটঙ্কীর গান গাই নি। যদি ভাল গাইতে না পারি ওরা দল থেকে ছাড়িয়ে দেবে। তখন কোথায় থাকবে মাংস, কোথায় থাকবে দুধ, আর কোথায় থাকবে এত আরাম আর সুখ—'

'আহা—'

'কী?'

'গাইতে পারবি না কেন, জরুর পারবি। মন দিয়ে চেষ্টা করলে সব পারা যায়। এমন একটা কাজ যখন কপালে জুটেছে তখন যাতে টিকে থাকতে পারিস তা দেখতে হবে।'

ছিবলি বোঝে, শেষ বয়েসের আরামটুকু আর ছাড়তে রাজী নয় ধনপত। সেটুকু যাতে বজায় থাকে সে জন্য ছিবলিকে প্রাণপণে গাইতে হবে; চাকরিটা যাতে না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

বাপের মনোভাব বুঝতে পেরে কিছু বলে না ছিবলি।

ধনমানিকপুর থেকে বেরুবার পর সাত দিন ধরে বয়েল গাড়িগুলো সমানে চলেছে। রান্নাবান্নার জন্য গাছতলা দেখে তারা খানিক থামে; তারপরেই যতিভঙ্গ। রাত্রিবেলা বিশ্রামের জন্যও অবশ্য থামতে হয়। ভোর হতে না হতেই আবার চলার শুরু।

ছিবলি শুনেছে তারা সোজা চম্পারন জেলায় রওশনগঞ্জে চলেছে। মাঘমাসের সংক্রান্তিতে সেখানে পাঁচপীরের মেলা বসে। পনর দিন ধরে মেলাটা চলে। লোক হয় প্রায় হাজার পঞ্চাশেকের মত। সেখানে গিয়ে কামেশ্বরের দল আসর পেতে বসবে।

ধনমানিকপুর থেকে বেরিয়ে দু-দিন চলবার পর তৃতীয় দিন বিকেলে কামেশ্বর ছিবলিদের গাড়িতে এসেছিল। বলেছিল, 'দুটো

দিন তো গেল, এবার তা হলে কাজে বসা যাক।'

বুঝতে না পেরে ছিবলি শুধিয়েছিল, 'কী কাজ?'

'গান টান তুমি খুবই ভাল গাইতে পার। তবু নৌটঙ্কীর গানের আলাদা একটা ধরন আছে; গানের পদও তার আলাদা; সে সব তোমায় শিখতে হবে।'

ছিবলি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, 'জরুর।'

'আমার ইচ্ছে আজ থেকেই তুমি শিখতে শুরু কর।'

'আমার আপত্তি নেই।'

একটু ভেবে কামেশ্বর বলেছিল, 'এখন আমরা রওশনগঞ্জের মেলায় চলেছি; গিয়ে পৌঁছুতে আরো পাঁচ ছ'দিন লাগবে। এর ভেতর তোমার তালিম শেষ হয়ে যাবে। আমার ইচ্ছে রওশনগঞ্জের মেলাতেই তুমি গাইতে পারবে।'

ধনপত এবার বলে উঠেছিল, 'খুব ভাল কথা শর্মাজী, খুব ভাল কথা। এতকাল তো পথে-ঘাটে গেয়েছে; এবার আসরে উঠে গাইতে পারবে। কত সৌভাগ্য ওর।'

ছিবলি বলেছিল, 'আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে। রওশন-গঞ্জের মেলাতেই আমি গাইব।'

তালিম শুরু হল। চলমান বয়েল গাড়িতে বসেই নৌটঙ্কীর নাচ গান এবং অভিনয় শেখাতে লাগল কামেশ্বর।

গানটা ছিবলি ভালই জানত। সে যেন বনের পাখি; পৃথিবীর সব শব্দ সব ধ্বনি নিমেষে গলায় তুলে নিতে পারত। অভিনয়েও সে পটিয়সী হয়ে উঠল। তবে নাচটা তেমন আয়ত্ত করতে পারল না। প্রথমত দোলায়মান বয়েল গাড়ি নাচ শেখার উপযুক্ত জায়গা নয়। দ্বিতীয়ত নৃত্যকলার মুদ্রাগুলি খুবই দুরূহ। মাত্র ক'টা দিনের ভেতর তা শেখা অসম্ভব।

যাই হোক তালিম শেষ হতে না হতে রওশনগঞ্জে পৌঁছে গেল ছিবলিরা। মোটামুটি বেশ বড় মেলাই বসেছে এখানে।

পৌঁছেই তাঁবু খাটিয়ে আসর পেতে বসল কামেশ্বর। তারপর ছিবলির গান এবং অভিনয় নতুন করে আরেক বার ঝালিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকের দিনটা তোমার জীওনে একটা দিনের মত দিন। আজই পয়লা তুমি আসরে উঠবে।'

জ্ঞান হবার পর থেকে গেযে আসছে ছিবলি—হাটে-গঞ্জে-বাজারে-বন্দরে, হাজার মানুষের সামনে। এ ব্যপারে তার লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। একেবারে অসঙ্কোচ আর সাবলীলা সে। কিন্তু নৌটঙ্কীর আসরে উঠবার আগে হঠাৎ সে ভয় পেয়ে গেল। এর নামই বোধ হয় স্নায়ুভীতি।

কাঁপা শিথিল সুরে ছিবলি বলল, 'আমার ডর লাগছে।'

'কিসের ডব ?'

'আমি কোনদিন আসরে উঠে গাই নি।'

'তাতে কিছু যাবে আসবে না। মনে সাহস আনতে চেষ্টা করো।'

'পারছি না।'

ছিবলির পিঠে হাত রেখে উৎসাহিত করতে লাগল কামেশ্বর, 'কিছু ডর নেই ; তুমি সামনের লোকেদের দিকে তাকাবে না। মনে করবে কেউ কাছে নেই ; ফাঁকা জায়গায় বসে তুমি গাইছ।'

ছিবলি বোঝাতে পারল না, তার ভয়টা কোথায়। এতকাল সে গেয়েছে নিজের খুশিমত, যখন ইচ্ছা হয়েছে গলা চড়ায় তুলেছে, ইচ্ছা হলে খাদে নামিয়েছে। ইচ্ছা হলে গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেছে। যা কিছু করেছে আপন খেয়ালে, কারো নির্দেশে বা ইঙ্গিতে নয়। কিন্তু আসরে উঠে গাইলেই তো হল না ; এর সঙ্গে হাজারটা বাঁধাবাঁধি জড়ানো। এখানে সময় অফুরন্ত নয়, নির্দিষ্ট সময়টুকুর ভেতর পালা শেষ করতেই হবে। তা ছাড়া নৌটঙ্কীর অভিনয় এবং গানের কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়ম আছে ; সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে মানতে হয়। নৌটঙ্কীর দল ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান। নিয়ম বাদ দিয়েও ওই গানের সঙ্গে দলগত সুনাম-দুর্নামের প্রশ্ন আছে, উপার্জনের প্রশ্ন আছে। কাজেই ছিবলির ভয় পাওয়াটা অসম্ভব কিছু না।

কামেশ্বর শর্মা অভিজ্ঞ দলনায়ক ; যৌবনের শুরু থেকেই নৌটঙ্কীর দল চালিয়ে আসছে। সে জানে, প্রথম আসরে উঠবার সময় সবাই এমন ভয় পায়। কাজেই ছিবলির মনে সাহস সঞ্চারের জন্য তাকে একরকম আগলে আগলে রইল সে।

নিজে কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ছিবলিকে জমকালো পোশাক পরালো, তারপর হাত ধরে আসরে তুলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

নৌটঙ্কীর আসর রাত্রের দিকেই বসে। ঝলমলে আলোয় গাইতে উঠে ছিবলির মনে হল, কেউ বুঝি হাত-পা বেঁধে তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছে। সামনের দিকে যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ আর মানুষ। সারা রওশনগঞ্জের মেলাটা যেন ভেঙে পড়েছে নৌটঙ্কীর আসরের চারধারে।

দেখতে দেখতে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল ছিবলির ; মনে হল কানের কাছে অশ্রান্ত গুঞ্জনে লক্ষ ঝিঁঝি ডাকছে। এত আলো চারদিকে তবু মনে হল, গাঢ় অন্ধকারে সব ঢেকে যাচ্ছে।

আসরে উঠেই ছিবলির গাইবার কথা। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে কিছুতেই মুক্ত করে আনতে পারল না সে।

গায়িকা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে, কাজেই দর্শকরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তাদের ঠেকাবার জন্য কামেশ্বরের ইঙ্গিতে কনসার্ট বেজে উঠল। উদ্দাম বাজনার ভেতর কামেশ্বরের গলা শোনা গেল, 'সংয়ের মত দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে এতগুলো টাকা দিয়ে দলে এনেছি? গান ধর—'

ছিবলি চমকে উঠল ; নিমেষে স্নায়ু থেকে সব ভয় সব জড়ত্ব মুছে গেল। কামেশ্বরের কাছ থেকে এমন রূঢ়তা সে আশা করে নি। একটুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে ছিবলি ভাবল, ঠিকই করেছে কামেশ্বর। মাসে মাসে আশীটা করে টাকা দেবে, দুটো মানুষের খাওয়া-পরা থেকে যাবতীয় খরচ চালাবে, অথচ তার বদলে কিছু পাবে না—এ কোনমতেই হতে পারে না। একজন শুধু দিয়েই

যাবে, আরেকজন শুধু নেবেই—সংসারে এ নিয়ম অচল। হাত পেতে নিলে তার প্রতিদানে কিছু দিতে হয়, অন্তত নৌটঙ্কীর গান যখন কামেশ্বরের ব্যবসা।

কামেশ্বরের গলা আবার শোনা গেল, 'এখনো দাঁড়িয়ে আছ? না যদি গাইতে পার নেমে এস, অন্য মেয়ে আসরে তুলব।'

বিভ্রান্তের মত আরেক বার সামনের দিকে তাকাল ছিবলি। অসহিষ্ণু বিপুল জনসমুদ্র কনসার্টের বাজনায় কিছু শান্ত আছে বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি গান শুরু না করলে ফল খুব সুখকর হবে না।

এত মানুষ কিন্তু একজনও চেনা নয়। ধনমানিকপুরে থাকতে অসংখ্য মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে গেয়েছে ছিবলি কিন্তু তারা সবাই ছিল পরিচিত; ছিবলির প্রতি স্নেহপ্রবণ। গানে ভুল ত্রুটি ঘটলে কেউ আর হাতে মাথা কাটত না বরং অপার মমতা দিয়ে তা ঢেকে দিত।

কিন্তু নগদ কড়ি গুণে দিয়ে এই অপরিচিত জনতা গান শুনতে এসেছে। এদের কাছে কোন ভুলেরই ক্ষমা নেই। অসহায়ের মতন চারদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একটি চেনা মুখ আবিষ্কার করে ফেলল ছিবলি। একেবারে পয়লা সারিতে ফুলনরাম বসে আছে; তার দৃষ্টি ছিবলির মুখে স্থির নিবদ্ধ। চিরদিনের মতন অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রয়েছে।

অন্তত একটি চেনা মানুষও পাওয়া গেছে। মনের ভেতর অনেকখানি সাহস পেল যেন ছিবলি। কোনদিন কাছে আসে নি ফুলনরাম, একটি কথাও বলে নি। দূরে দূরেই থেকেছে; তবু এই বাজে পোড়া ঢ্যাঙা তালগাছের মতন লোকটা ছিবলির সত্তার ভেতর দুর্জয় খানিকটা শক্তি সঞ্চার করে দিল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন এবার গেয়ে উঠল ছিবলি। তীক্ষ্ণ মধুর একটা টানে স্বরটাকে চূড়ায় পৌঁছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কামেশ্বরের ইঙ্গিতে কনসার্ট বাজনা থেমে গেল; যা আরম্ভ হল তা ছিবলির গানেরই সঙ্গত।

এরপর ঘোরের মধ্যে গেয়ে চলল ছিবলি। গান শেষ হল শেষ রাতে ; এর ভেতর একবারও তাল কাটল না, ছন্দে-লয়ে-তানে কোথাও এতটুকু ভুল হল না। এমনিতেই তার গলা মধুর, সুরেলা, রসপূর্ণ। তার ওপর কামেশ্বরের শিক্ষায় তা প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে। প্রথম আসর গেয়েই দর্শকদের জয় করে নিল ছিবলি।

গাইতে গাইতে বার বার ছিবলির দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল ফুলনরামের ওপর। চিরদিনের বিস্ময়ের সঙ্গে তার চোখে আজ আরো কিছু রয়েছে ; তার নাম অভিনন্দন। নৌটঙ্কীর আসরে ছিবলির প্রথম সাফল্যকে অভিনন্দিত করে যাচ্ছিল ফুলনরাম।

পালার শেষে আসর থেকে নেমে এলে কামেশ্বর বলল, 'বহুত আচ্ছা ছিবলি, বহুত আচ্ছা।' পয়লা দিন আসরে উঠলে লোকে ঘাবড়ে যায়, গলা কাঁপে। কিন্তু তুমি একেবারে মাত করে দিয়েছ। প্রথম যেদিন ধনমানিকপুরে তোমাকে দেখি সেদিনই বুঝেছি তুমি খাঁটি জেবর।'

দর্শকদের ঘন ঘন হাততালি, অভিনন্দন, মুগ্ধতা ছিবলিকে অভিভূত করে দিয়েছিল। কামেশ্বরের স্তুতির কোন উত্তর সে দিল না।

কামেশ্বর আবার বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছ ?'

'রাগ !' এবার গলায় স্বর ফুটল ছিবলির, 'কেন ?'

'তখন তোমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলাম সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আর বলেছিলাম, গাইতে না পারলে আসর থেকে নামিয়ে অন্য মেয়েকে দিয়ে গাওয়াব। কেন বলেছিলাম জানো ?'

অস্ফুটে ছিবলি বলেছিল, 'কেন ?'

'লক্ষ্য করেছিলাম আসরে উঠে তুমি ঘাবড়ে গেছ। এই সময় মনে ঘা দিয়ে কথা না বললে তোমার জেদ আসবে না। তাই ওভাবে বলেছিলাম।'

'বেশ করেছিলেন। অমন করে না বললে সত্যিই আমার জেদ আসত না। এতে আমার উপকারই হয়েছে।'

'যাক ভারি ভাবনা ছিল ; রাগ করো নি জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।'

ছিবলির সাফল্যে ধনপতও খুশি। খাওয়া দাওয়া সেরে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে সে বলল, 'তুই যা গেয়েছিস ছিবলি তাতে শর্মাজীর মাথা ঘুরে গেছে।'

ছিবলি কিছু বলল না।

ধনপত গদগদ গলায় বলতে লাগল, 'আমি বলে রাখলাম ছিবলিয়া, এই দলে তোর চাকরি পাকা হয়ে গেল। কোন শালে লোগ তোকে আর হটাতে পারবে না। আর দেখে নিস দু-চার মাস গেলে নির্ঘাত তোর মাইনে বাড়িয়ে দেবে শর্মাজী।'

ধনপতের গদগদ হবার কারণ আছে। ছিবলির ভাল গাওয়া, চাকরি পাকা হওয়ার সঙ্গে ধনপতের শেষ জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। নৌটঙ্কীর দলে এসে যে সুখ যে আরাম সে পেয়েছে সারা জীবন তা ছিল অনাস্বাদিত। এ সব ছেড়ে নতুন করে সেই পুরনো কষ্ট দারিদ্র্য আর উঞ্ছবৃত্তির ভেতর ফিরে যেতে চায় না ধনপত। মেয়ের প্রশংসাটা ওপর থেকে দেখলেই চলবে না, তার নেপথ্যে অন্য একটা খেলাও আছে। সেখানে ধনপতের মনোভাবটা গভীরগামী। মেয়েকে প্রশংসা করলে সে আরো মনোযোগ দিয়ে গাইবে ; চাকরিটা বজায় রাখতে চেষ্টা করবে। তাতে ছিবলির সুবিধা তো বটেই ; ধনপতেরও সুবিধা।

যাই হোক রওশনগঞ্জের মেলায় এক আসর গেয়েই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ছিবলির। পনর দিনের মেলা। পনর দিনই পালা গেয়েছিল কামেশ্বরের দল আর এই পনর দিনই আসরে উঠতে হয়েছিল ছিবলিকে।

প্রথম দিনের চাইতে দ্বিতীয় দিন দর্শক বেশি হয়েছিল, তার পরের দিন আরো বেশি, তার পরের দিন আরো বেশি। শেষ দিনে শুধু মেলার লোকই না, আশেপাশের গ্রামগুলো উজাড় হয়ে লোকেরা ছিবলির গান শুনতে এসেছিল।

শুধু প্রশংসা, খ্যাতি আর অভিনন্দন। তা ছাড়া দলের ব্যবসার দিক থেকে লাভও কম হচ্ছে না। আজ যা আয় হচ্ছে, পরের দিন তার দ্বিগুণ হচ্ছে, তার পরের দিন তিন গুণ। এইভাবে রওশনগঞ্জের মেলায় দিনের পর দিন আয় বেড়েই গেছে।

কাজেই কামেশ্বর খুব খুশি। দলের আয় এবং মর্যাদা যে বেড়েছে তা গোপন রাখে না সে। বলে, 'তুমি আমার দলের লছমী ছিবলি। তোমার জন্যে দলের কদর বেড়ে গেছে।'

ছিবলিও পরিতৃপ্ত। জমকালো পোশাক পরে গাইতে ওঠা, ঝলমলে পালাগানের আসর, অজস্র অভিনন্দন, খ্যাতি, দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টি—সব মিলিয়ে সে যেন এক মোহময় স্বপ্নের জগতে এসে পড়েছে। শুধুমাত্র গান গেয়ে অভিনয় করে যে দু হাত ভরে, সমস্ত হৃদয় ভরে এত পাওয়া যায়, মন যে এত পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে—এ ধারণা আগে তার ছিল না। সর্বক্ষণ একটা ঘোরের ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে আছে ছিবলি।

পনর দিন সমানে গাইছে ছিবলি। আসরে উঠেই প্রতিদিন সে লক্ষ্য করেছে, দর্শকদের ভেতর বসে রয়েছে ফুলনরাম। দূরে নয়, মাঝখানেও নয়, একেবারে পয়লা সারির পয়লা জায়গাটা প্রত্যহ তার জন্য নির্দিষ্ট। লোকটার বিস্ময় যেন আর কাটে না; ধনমানিকপুরের গঞ্জে প্রথম দিন তাকে দেখে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, আশ্চর্য, এতকাল পরও সেই দৃষ্টিই তার আছে। ছিবলি সম্বন্ধে তার বিস্ময় বুঝি কোনদিনই কাটবে না।

রওশনগঞ্জের মেলার আয়ু মাত্র পনর দিন; দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।

নৌটঙ্কীর দলগুলোর কোথাও পা পেতে বসার অবকাশ নেই। এক মেলা শেষ হতেই আরেক মেলায় তাদের ছুটতে হয়। এই ভাবে সারা উত্তর ভারতের মেলায়-মেলায়, গঞ্জে গঞ্জে, জনপদে জনপদে তারা টহল দিয়ে ফেরে।

রওশনগঞ্জের মেলা শেষ হতে না হতেই বয়েল গাড়িতে মালপত্র তুলে কামেশ্বররা রওনা হল মজঃফরপুর, সেখান থেকে চম্পারণ, তারপর গয়া, সারণ, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া। কত জায়গায় যে তারা ঘুরল তার হিসেব নেই। যেখানে যত আসর বসেছে সব আসরেই গাইতে হয়েছে ছিবলিকে, অভিনয় করতে হয়েছে, এমন কি নাচতেও।

গাইতে গাইতে সাহস বেড়ে গেছে ছিবলির, আত্মবিশ্বাসও। দর্শকরা কী চায়, কী দিলে সহজেই তাদের সন্তুষ্ট করা যায়, তাদের রুচি কেমন—সব এখন ছিবলির আয়ত্তে। তার একটি ইঙ্গিতে অশান্ত দর্শক নিমেষে সম্মোহিত হয়ে যায়।

ছিবলির মনে হয়, এই দর্শকরা যেন অবুঝ শিশুর দল। সামান্য কৌশলেই তাদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা যায়। আর দর্শককে যে বশে আনতে পেরেছে নৌটঙ্কীর দলে তার মার নেই।

এর ভেতর আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেছে। কামেশ্বর শর্মা নির্জলা তোষামোদই করে নি। একদিন এসে বলেছে, 'ছাখো ছিবলি, আমি অকৃতজ্ঞ নই। তোমার জন্যে আমার দলের নাম বেড়েছে, রোজগার বেড়েছে। কাজেই তোমায় ঠকাতে চাই না।'

কামেশ্বর কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থেকেছে ছিবলি।

কামেশ্বর বলেছে,'তোমাকে আরো কিছু দিতে চাই।'

ছিবলি নিরুত্তর।

কিন্তু ধনপত বলেছে, 'কী দেবেন ?'

'ছিবলির মাইনে বাড়িয়ে দেব।'

'কত ?'

'আশী টাকা করে পাচ্ছে। কুড়ি টাকা বাড়িয়ে একেবারে এক শ' করে দেব।'

'উঁহু—'

'কী ?'

'দেড়শ করে দিন।'

একটু চুপ করে থেকে কামেশ্বর বলেছে, 'এক সঙ্গে ঝপ করে অত টাকা বাড়ানো যাবে না।'

ধনপত জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন?'

'অসুবিধে আছে।'

'কিসের?'

'দলের অন্য গাইয়ে-বাজিয়েরা ক্ষেপে উঠবে।'

'লেকেন তাদের জন্যে নয়, আমার লড়কীর জন্যেই আপনার দলের নাম বেড়েছে, আয় বেড়েছে। এ কথা একটু আগে আপনি নিজেই বললেন।'

'এখনও বলছি; তবে একটা কথা—'

'কী?'

'একা ছিবলিকে দিয়ে তো দল চলবে না ধনপতজী; সবাই বেঁকে বসলে বিপদ হবে।'

ইদানীং একটা ব্যাপার ঘটেছে। প্রথম প্রথম ধনপতকে 'তুমি' বলত কামেশ্বর, ধনপত বলত। ছিবলির গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামটার শেষে গৌরব সূচক একটা 'জী' যোগ করেছে; 'তুমি' টা 'আপনি' হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দর কষাকষির করে মাইনেটা এক শ' কুড়ি টাকায় রফা হয়েছিল।

এ তো গেল নৌটঙ্কী দলের দিক। অন্য একটা দিকও ছিল। কোথায় চম্পারণ, কোথায় সারণ, কোথায় ভাগলপুর আর কোথায়ই বা পূর্ণিয়া—যেখানেই ছিবলিরা গেছে ফুলনরামের দৃষ্টি নিয়ত আরো অনুসরণ করেছে। ধনমানিকপুরে থাকতে চোখ ফেরালেই যেমন দেখা যেত নৌটঙ্কী দলের সঙ্গে মেলায় মেলায় ঘুরতে ঘুরতে তেমনই দেখা যায়, ফুলনরাম তার দিকে তাকিয়ে আছে। আসরে উঠে দর্শকদের ভেতর ফুলনরামকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল ছিবলি।

ধনমানিকপুরে থাকতে ছটো বছর দূর থেকেই তাকে দেখে গেছে ফুলনরাম, কাছে এসে একদিনও একটি কথা বলে নি। নৌটঙ্কী দলের পেছনে ঘুরতে ঘুরতেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। দূর থেকেই নিজের অস্তিত্ব বুঝিয়ে ছায় ফুলনরাম কিন্তু ভুলেও সামনে আসে না।

॥ পাঁচ ॥

দেখতে দেখতে বছরখানেক কেটে গেল। এর মধ্যে নৌটঙ্কী দলের ভেতর এবং বাইরের সব খবরই জেনে ফেলেছে ছিবলি।

এই কিন্নরলোকের বাইরের দিকটা যত ঝলমলে এবং মোহময়, নেপথ্যে ঠিক সেই পরিমাণেই অন্ধকার। সেখানে নেশা, জুয়া আর ব্যভিচারের স্রোত বয়ে চলেছে।

নৌটঙ্কীর দলগুলোতে নাচ গানের জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়কেই রাখতে হয়। এক বছর আছে; কাজেই দলের অভিনেতা-অভিনেত্রী-গায়ক-গায়িকা-নাচনদার-বাজনদার, সবার সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে ছিবলির। অভিনেতা-অভিনেত্রী হলেই এখানে গান জানতে হয়। নাচ সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতা নেই, তবে জানলে ভাল।

দলে পুরুষের সংখ্যা বারো জন; মেয়ের সাত। পুরুষদের মধ্যে আছে হরিয়া, চতুর্ভুজ, মহাদেও, ঢোড়াই, গণেশ, শিবলরাম, মোহন, কৌশল, জানকী, লৌটন, সোহনলাল এবং শিউপূজন। মেয়েদের মধ্যে আছে চুহা, আমিনা, নয়না, লাখপতিয়া, রামপূজারী, শিউপিয়ারী এবং ছিবলি স্বয়ং। চম্পা বলে একটা মেয়ে ছিল, সে অন্য দলে চলে গেছে। তা ছাড়া রান্নার লোক, বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান—এরা তো আছেই।

ছিবলি লক্ষ্য করেছে সে ছাড়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে বাপ-ভাই-মা বা অন্য আপনজন কেউ নেই। এই নৌটঙ্কীর দলে তারা একা একাই

আছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার সময় মেয়েরা প্রত্যেকে একটা করে গাড়ি পায়; পুরুষদের বেলায় প্রতি দু-জনের একটা করে গাড়ি। তবে দলের সব চাইতে বড় অভিনেতা, গাইয়ে এবং নাচিয়ে শিউপূজনের কথা ভিন্ন—সে আলাদা একখানা গাড়ি পায়। দলের মালিক কামেশ্বরের জন্যও আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা।

দলটা চলতে চলতে যখন কোন মেলায় কি গঞ্জে কি বড় কোন বিকিকিনির জায়গায় এসে থামে সেই সময় সারি সারি তাঁবু পড়ে। গাড়ির মত তাঁবুগুলোও ঐ একইভাবে মেয়ে আর পুরুষদের ভেতর ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়।

চলতে চলতে একেক দিন রাত্তিরে যখন ঘুম আসে না, ছিবলি বয়েল গাড়ির ছইয়ের বাইরে গিয়ে বসে। দু ধারের নিঝুম প্রান্তর, দূর বনভূমি, ঝিম ঝিম চাঁদের আলো কিংবা আকাশময় তারার মেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে প্রতিটি মেয়ের গাড়িতে একেকটা পুরুষ চোরের মত চুপি সাড়ে গিয়ে উঠে পড়ছে। মেলায় কি গঞ্জেও সেই একই ব্যাপার। বয়েল গাড়ির বদলে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ সঞ্চারে সেখানে তাঁবুর ভেতর যাওয়া-আসা। ব্যভিচারের কোন সীমা-পরিসীমা বুঝি নেই; মানুষের জৈবপ্রবৃত্তি এখানে উদ্দামভাবে মুক্তি পেয়েছে। এ ছাড়া দিশী মদ, গাঁজা, চরস—এমনি রকমারি নেশার মত্ততা তো আছেই। আর আছে জুয়া।

দেখতে দেখতে ছিবলি জেনে ফেলেছে প্রতিটি মেয়েরই একটি করে প্রণয়ী আছে। যেমন আমিনার মনের মানুষ ঢোড়াই, লাখপতিয়ার লৌটন, শিউপিয়ারীর মোহন, রামপূজারীর গণেশ, চুহার সোহনলাল, নয়নার কৌশল।

তিনটি মেয়ে আছে, আমিনা নয়না আর চুহা—তাদের আবার দু-তিনটি করে মনের মানুষ। একজন গেলে তাদের তাঁবু কি গাড়িতে আরেক জন আসে। যতক্ষণ প্রথম জন ভেতরে থাকে দ্বিতীয় লোকটি অস্থির ভাবে ছোঁক ছোঁক করতে থাকে। ফলে দেখা গেছে, এ দলের

প্রতিটি পুরুষ এবং মেয়ে আদিম অন্ধকার যুগের যৌনলালায় মেতে আছে।

একদিন একটা জঘন্য কাণ্ড ঘটেছিল।

চুহার তাঁবুতে গিয়ে তো ঢুকেছে সোহনলাল। তার খানিক পর জানকী এসে হাজির। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে উঠল সে। অস্থিরতাটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছলে শেষ পর্যন্ত সোহনলাল ভেতরে থাকতেই সে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে কী হয়েছিল ছিবলি বলতে পারবে না। তবে খুব চেঁচামেচি আর ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে চলছিল অকথ্য খিস্তির আদান-প্রদান।

'শুয়ারকা বাচ্চা—'

'তেরা বাপ শুয়ারকা বাচ্চা।'

'তেরা বাপ।'

'নহী, তেরা বাপকে বাপ।'

'তেরা বাপকে বাপ।'

খিস্তির সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ শব্দ। যুগপৎ ঘুষি লাথি কীলও চলছিল। একটু পর তাঁবুর পর্দা ছিঁড়ে জড়াজড়ি করতে করতে হুড়মুড় করে বাইরে এসে পড়েছিল দুজনে। তারপর শুরু হয়েছিল নতুন উদ্যমে লড়াই। গজ-কচ্ছপ যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি দেখবার জন্য অন্য তাঁবু থেকেও সবাই ছুটে এসেছিল।

অবাক বিস্ময়ে ছিবলি লক্ষ্য করেছে, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই চুহা ঠোঁট বাঁকিয়ে বিচিত্রভাবে হাসছে।

এ তো গেল অন্য মেয়ে পুরুষদের কথা। কিন্তু কামেশ্বরের পর এ দলে যার মর্যাদা সব চাইতে বেশি সেই সেরা নাচিয়ে-বাজিয়ে-গাইয়ে এবং অভিনয়ে-পটু লোকটি কিন্তু কারো তাঁবুতে হানা দেয় না. অথবা চুপিসাড়ে কারো গাড়িতে গিয়ে উঠে না। যখন যাকে দরকার তা আমিনা হোক, চুহা হোক, লাখপতিয়া কিংবা যে কেউ হোক—

নিজের কাছে ডেকে পাঠায়। তার ডাক অমান্য করার দুঃসাহস কারো নেই। প্রথমত তার সামান্য একটুকরুণা পাবার জন্য সবাই লালায়িত। সে বলে দিলে এক কথায় মাইনে বেড়ে যাবে, মর্যাদা বাড়বে। তা ছাড়া স্থায়ীভাবে শিউপূজনের প্রণয়িনী হতে পারলে আরো নানা দিক থেকে লাভ। কাজেই তার মনোরঞ্জনের জন্য নৌটঙ্কী দলের মেয়েদের ভেতর দুরন্ত প্রতিযোগিতা চলে।

দেখে শুনে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল ছিবলির।

ছিবলি পথের মেয়ে। জন্মের পর থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়ালেও তার জীবনে তমোগুণের কোন প্রশ্রয় নেই। যা খারাপ, যা জঘন্য, যা কুৎসিত—সে সবের প্রতি তার নিদারুণ ঘৃণা। একদিন সোজা গিয়ে সে কামেশ্বরকে ধরল, 'আপনার সাথ একটা কথা ছিল।'

ছিবলিকে বসিয়ে সাগ্রহে কামেশ্বর বলল, 'তার আগে বল কী খাবে? চা না লস্যি?'

'চা-ই আনান।'

চা এলে কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে কামেশ্বর বলল, 'নাও, এবার বল।'

'দলে এ সব কী হচ্ছে?'

'কোন সব?'

নৌটঙ্কী দলে এক বছরে ব্যভিচারের যত লীলা দেখেছে, একটি মেয়ের পক্ষে যতখানি বলা সম্ভব সব বলে গেল ছিবলি।

শুনে চুপ করে রইল কামেশ্বর।

ছিবলি বলল, 'মুখ বুজে থাকলে চলবে না।'

মৃদু হেসে কামেশ্বর বলল, 'কী বলব, বল—'

'এর একটা বিহিত আপনাকে করতে হবে। দলে এমন বদমাসি নোংরামি চলা ঠিক না।'

'আমি কী করতে পারি?'

ছিবলি অবাক হয়ে গেল, 'কি তাজ্জবের কথা, আপনি দলের মালিক, আপনিই তো করবেন। দল থেকে বদমাস হারামীদের লাথ

মেরে বার করে দেবেন।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল কামেশ্বর। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'না।'

ছিবলির বিস্ময় এবার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল, 'কী না ?'

'কোন বিহিতই আমি করতে পারি না। আমার হাত-পা সেদিক থেকে একেবারে বাঁধা।'

'দলের মালিক হয়ে এ আপনি কী বলছেন ?'

'ঠিকই বলছি ছিবলি।'

'কেন শয়তানগুলোকে বার করতে পারেন না শুনি ?' ছিবলির চোখমুখ এবং কণ্ঠস্বর এবার বেশ বিরক্ত শোনাল।

'তা হলে আমার দল ভেঙে যাবে।'

ছিবলি বলল, 'ভাঙবে কেন, এদের তাড়িয়ে ভাল লোক এনে দল করুন।'

কামেশ্বর হাসল।

ছিবলি বলল, 'হাসলেন যে ?'

'তোমার কথা শুনে।'

'হাসবার মত কী এমন বলেছি ?'

'নৌটঙ্কী দলের হালচাল তুমি কিছুই জানো না ছিবলি, তাই এমন কথা বলছ। এ লাইনের প্রায় সব লোকই এইরকম। তাদের ভেতর থেকে ভাল লোক খুঁজে বার করা মুশকিল। কোন উপায় নেই ছিবলি, এদের নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়।'

ছিবলি কী বলবে ভেবে পেল না।

কামেশ্বর আবার বলল, 'ওসব নিয়ে মন খারাব কোরো না ছিবলি। ওদিকে নজর দিও না।'

আর কিছু না বলে ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট মুখে উঠে পড়ল ছিবলি।

যাই হোক, এই নৌটঙ্কীর দলে পাঁকের মাছের মত কিংবা

জলের হাঁসের মত সমস্ত গ্লানি আর নোংরামির উর্ধ্বে ভেসে থাকতে চেষ্টা করে ছিবলি। কারো দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর মুখে সে নাচগানের তালিম নেয়; আসরে পালা গেয়ে রাজেন্দ্রাণীর মত নিজের তাঁবুটিতে চলে যায়। দলের সঙ্গে এর চাইতে বেশী সম্পর্ক নেই ছিবলির। দলে থেকেও সে যেন দলছাড়া; অচেনা আগন্তুকের মত সে যেন নৌটঙ্কী দলের বাইরের দিকে উদাসীন আনমনে ভেসে বেড়ায়।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার সময় বয়েল গাড়িতেই সে থাকে। মেলায় কি গঞ্জে এলে আসরে গাইবার সময়টুকু বাদ দিলে দিনের অবশিষ্ট অংশ বাপের সঙ্গে নিজের তাঁবুতেই কাটিয়ে দেয়।

দলের রান্না এবং খাওয়ার ব্যবস্থা বারোয়ারী। চলতে চলতে কোন গাছের ছায়ায় গাড়ি থামিয়ে কিংবা গঞ্জে-বন্দরে এলে কোন হাটুরে চালায় দলের ঠাকুর-চাকরেরা রাঁধতে বসে। রান্নাবান্না শেষ হলে দলের প্রতিটি মানুষ, এমন কি শিউপূজন, কামেশ্বর পর্যন্ত সারি দিতে খেতে বসে।

ছিবলি কিন্তু ঐ হাটের ভেতর সবার সঙ্গে বসে খায় না। এমন কি ঐ বারোয়ারী রান্নাও খায় না। অন্ধ বাপ এবং নিজের জন্য সে আলাদা রান্না করে নেয়।

সবার কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে চাইলে কি হবে, চারপাশে সর্বব্যাপী অন্ধকারের ভেতর তা বুঝি সম্ভব না। আশেপাশে যারা আছে, পাতালের সেই পোকাগুলো যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যেভাবেই হোক ছিবলিকে অতলে টেনে নিয়ে যাবে।

প্রথম প্রথম দলের পুরুষগুলো তাকে বিশেষ ইঙ্গিত দিত। ছিবলি গ্রাহ্য করত না। সে পাশ দিয়ে গেলে নানারকম মন্তব্য করত।

কেউ বলত, 'শালী বড় সতী এসেছে।'

কেউ বলত, 'ঘুরত তো রাস্তায় রাস্তায়; বাজারে বাজারে। রাস্তা-বাজারের লোক কিছু রেখেছে ওর। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে।

তার আবার অত !'

যারা দুঃসাহসী তারা বলত, 'ধর তো মাগীকে চেপে ; দেখি ওর গায়ে কোন জায়গাটায় সতীত্ব আছে।'

পেছন থেকে সবাই আক্ষেপ আর অক্ষম লালসার তীর ছুঁড়ত কিন্তু সামনাসামনি এসে দাঁড়াবার সাহস কারো ছিল না।

পেছন ফিরে তাকাতও না ছিবলি ; সম্রাজ্ঞীর মত সদর্পে নিজের তাঁবুর দিকে চলে যেত।

কিন্তু মনের জোর যতই থাক তা তো সীমাহীন নয়। অশ্লীল অকথ্য মন্তব্য শুনতে শুনতে একদিন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ছিবলি। মুখে কিছুই সে বলে নি তবে চোখদুটো আগুনের হল্কার মত জ্বলছিল আর মুখটা গন গন করছিল। ভীরু কুকুরের দল সেই ভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে দাঁড়াতে পারে নি ; উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছিল।

তারপর থেকে মন্তব্য বন্ধ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু রাত্তিরে তাঁবুতে টোকা পড়ত। ফিসফিসিয়ে কারা যেন ডাকত, 'ছিবলি—ছিবলি—'

ডাকটা শুনতে পেত ছিবলি কিন্তু গলা চেনা যেত না। শুনতে শুনতে একদিন একটা দা নিয়ে বেরিয়েছিল ছিবলি ; চাঁদের আলোয় দায়ের ধারাল ফলাটা রুপোর পাতের মত ঝলকাচ্ছিল। আর কারা যেন তাঁবুর পাশ থেকে নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

লুকিয়ে চুরিয়ে চোরের মত যারা আসে, যারা কাপুরুষের মত অক্ষম কামনায় পুড়ে পুড়ে দূর থেকে মন্তব্য ছোঁড়ে—এ গেল তাদের কথা।

কিন্তু শিউপূজন চোর না, ডাকাত। সে একদিন সরাসরি ছিবলিকে বলল, 'তোমার গানা বহুত বড়িয়া ছিবলি।'

তার গানের প্রশংসা সবাই করে। শিউপূজনের প্রশংসা তার চাইতে আলাদা কিছু বলে প্রথমটা মনে হয় নি ছিবলির। নিঃশব্দে নম্র লাজুক চোখে একবার তাকিয়ে স্তুতিটুকু মাথা পেতে নিল সে।

শিউপূজন আবার বলল, 'কত সাল (বছর) আমি নৌটঙ্কী

দলে আছি জানো ?'

ছিবলির গলায় প্রতিধ্বনি উঠল, 'কত সাল ?'

'পন্দর সাল।'

'এত দিন !'

'হ্যাঁ।' মাথা হেলিয়ে শিউপূজন বলল, এই পন্দর সাল নৌটঙ্কীর দলে কত জায়গা ঘুরলাম, কত দেশ দেখলাম, কত গাইয়ে মেয়ে দেখলাম, লকীন—'

'লকীন কী ?'

'তোমার মত এমন মিঠি গলা আগে আর শুনিনি।'

নীরবে এই স্তুতিটুকুও মাথা পেতে নিল ছিবলি। লক্ষ্য করল স্থির মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে শিউপূজন। দৃষ্টিটা ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্লেষণ করে দেখার মত মানসিক অবস্থা নয় ছিবলির ; শিউপূজনের স্তুতি তখন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

শিউপূজন বলল, 'তোমাকে কত মাইনে ছায় এখানে ?'

ছিবলি আস্তে করে বলল, 'একশ' বিশ।'

'মোটে ?'

'জী।'

'না-না, ঐ টাকা দিলে কি করে চলবে ! কামেশ্বরকে আজই আমি বলব, দেড় শ টাকা করে যেন ছায়।'

ছিবলি বিব্রত মুখে বলল, 'না-না, আপনাকে আর তখলিফ করতে—'

বাধা দিয়ে শিউপূজন বলল, 'তখলিফ আবার কি ; ওর জন্যে তুমি ভেবো না। তোমার যা গলা তাতে মাইনে দেওয়া উচিত হাজার টাকা।'

ছিবলি কী বলবে ভেবে পায় না। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল হতে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না তার। শিউপূজন মানুষটা এমনিতে খুবই দাম্ভিক। দলে তার স্থান কোথায়, সে কত বড় গাইয়ে, কত

বড় নাচিয়ে, কত বড় অভিনেতা—সে সব সম্বন্ধে ভয়ানক রকমের সচেতন। মাটিতে যখন পা ফেলে, মনে হয়, ধরাখানাকে সরাজ্ঞান করছে। কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় না তাকে; সোজা দৃষ্টিতে কারো দিকে তাকায়ও না সে—চোখ কুঁচকে পিঙ্গল তারাদুটো এক কোণে এনে তেরছা দৃষ্টি হানে। মনে হয় কাছ থেকে নয়, অনেক উঁচু থেকে তলার ঘৃণ্য নগণ্য জীবগুলোর দিকে তাকিয়ে ধন্য করে দিচ্ছে।

আশ্চর্য, যে শিউপূজন সব সময় গর্ব আর দম্ভের বাষ্পে ঠাসা সেই লোকই যেচে এসে আলাপ করেছে, স্তুতিতে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে, তার মাইনে বাড়াবার জন্য ব্যস্ত ব্যগ্র হয়েছে। অথচ এত দিন হল সে দলে এসেছে, ক্বচিৎ কখনো দু-একটা কথা তার সঙ্গে শিউপূজন বলেছে কিনা সন্দেহ। বিস্ময় যেন আর কাটছে না ছিবলির; হঠাৎ তার ওপর এমন অযাচিত অনুগ্রহ কেন শিউপূজনের? ছিবলি বুঝে উঠতে পারছে না।

শিউপূজন বলল, 'আচ্ছা ছিবলি—'

'বলুন—'

'দেখেছি, তুমি দলের কারো সঙ্গে মেশো না, কারো সাথ কথা বল না।'

'জী, না।'

'কেন?'

ছিবলি চুপ করে রইল।

কামেশ্বর আবার বলল, 'কি, বল—'

ছিবলির একবার ইচ্ছা হল, সব কথা খুলে বলে। দলের পুরুষগুলো কি জাতীয় জীব, তাদের স্বরূপ কেমন—সমস্ত কিছু বলে তার মেলামেশা না করার কারণটা ব্যাখ্যা করে। কিন্তু কি ভেবে নিজেকে সংযত করল সে। নিস্পৃহ সুরে শুধু বলল, 'এদের সঙ্গে মিশতে আমার ভাল লাগে না।'

ঠোঁট আর নাক কুঁচকে একটা উপেক্ষার ভঙ্গি করল শিউপূজন, 'ভাল না লাগাই উচিত। এরা আবার মানুষ ! না মিশে, কথা না বলে ঠিক কর। দেখেছ নিশ্চয়ই আমিও কারো সাথ মিশি না।'

'জী।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শিউপূজন শুরু করল, 'কেন মিশি না জানো ?'

ছিবলি অবশ্যই বলতে পারত, তোমার যা গর্ব, যে রকম দম্ভে তুমি ঠাসা তাতে তো মাটিতে পা পড়ে না। লোকের সঙ্গে মিশবে কি। মনের কথা কিন্তু গোপন রাখল ছিবলি। খুব আস্তে শুধু বলল, 'জী, না।'

'এই হারামীগুলোর সাথ মেশা যায় না। লকীন—'

'কী ?'

'সারা দিন মুখ বুজে বসে থাকতে আমার ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা হয় লোকের সাথ একটু মিশি, কথা বলি। তা—'

'বলুন—'

'তোমার সাথ যদি একটু মিশি, দু-চারটে কথা বলি, আপত্তি আছে ?'

ছিবলির সত্তার ভেতর দিকে কোথায় যেন ছায়া পড়ল—গাঢ় গভীর কুটিল ছায়া। খানিক চকিত হল সে। এই শিউপূজন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে ছিবলি ; তার চরিত্রের অন্ধকারময় দিকটার অনেকখানিই তার জানা। তবু হাজার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে শিউপূজনের ব্যবহারে অথবা কথাবার্তায় এমন কিছু সে আবিষ্কার করতে পারল না যা ভয়াবহ। বরং শিউপূজনের আচরণ অত্যন্ত সংযত। তার প্রশংসা, স্তুতি—সবই প্রীতিকর। মাইনে বাড়িয়ে দেবার যে কথা শিউপূজন বলেছে তার ভেতরেও কোন ত্রুটি পাওয়া গেল না। তবু অস্বস্তিটা পুরোপুরি কাটল না ছিবলির। খানিক দ্বিধান্বিত সুরে সে বলল, 'না, আপত্তি কিসের।'

'তা হলে এক কাজ করো।'

'কী?'

'সময় টময় পেলে আমার তাঁবুতে এসো।'

আগের মত দ্বিধার সুরে ছিবলি বলল, 'আচ্ছা।'

শিউপূজন বলল, 'তা হলে ঐ কথা রইল; আমি এখন চলি।' সে চলে গেল।

ছিবলি বলেছে বটে যাবে, কিন্তু বলামাত্রই যেতে পারল না। আসলে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে উঠতে পারে নি সে। শিউপূজন সম্বন্ধে এত কথা সে শুনেছে যে ভয় আর সংশয়টা কিছুতেই কাটছে না।

অথচ শিউপূজন সম্পর্কে তার প্রাণে অন্য দিক থেকে আকর্ষণ আছে। লোকটা সত্যিকার গুণী; গানের গলাখানা তার চমৎকার। তা ছাড়া অভিনেতা হিসেবেও সে খুব উঁচু দরের।

এ দলে কামেশ্বর শর্মা নাচ-গান-অভিনয়ের তালিম দেয়। কামেশ্বরই যুগপৎ মালিক এবং শিক্ষক। ছিবলির ধারণা, শিউপূজনের হাতে তালিমের ভার থাকলে দলটা আরো ভাল গাইত। তার নাম আরো ছড়িয়ে পড়ত। নৌটঙ্কীর গানের এমন অনেক কৌশল শিউপূজনের আয়ত্তে যা কামেশ্বর জানে না।

ছিবলির আকর্ষণটা ঐ গান-বাজনার দিক থেকে। গানের প্রতি তার মোহ সহজাত। সেটা যত নির্ভুল আর নিখুঁত ভাবে শেখা যায় সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই তার। শিউপূজনের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারলে তারই লাভ।

শিউপূজন সম্বন্ধে ছিবলির প্রাণে আলোছায়ার খেলা আছে। আকর্ষণ আর বিতৃষ্ণা, দুয়ের মাঝখানে সে সমানে দোল খেতে লাগল।

একই দলে, ছোট জায়গার ভেতর থাকা। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে শিউপূজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। মুখোমুখি হলেই সে বলে, 'কই, এলে না তো?'

বিব্রত মুখে ছিবলি বলে, 'যাব।'

'যাব তো কবে থেকেই বলছ, যাচ্ছ আর কই।'

'এবার যাব।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

শেষ পর্যন্ত দ্বিধাটাকে কাটিয়ে ফেলল ছিবলি। একদিন সন্ধ্যে বেলা শিউপূজনের তাঁবুতে এল সে।

শিউপূজনের মুখ দেখে মনে হল, সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। উচ্ছ্বসিত সুরে বলল, 'আরে এসো, এসো—বোসো।'

শিউপূজনের তাঁবুতে আগে আর কখনও ঢোকে নি ছিবলি, এর ভেতর কী আছে সে জানতও না। চারদিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

লোকটার রুচি আছে। রাজারাজড়াদের বাড়ি দ্যাখে নি ছিবলি তবে সে সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে। নৌটঙ্কীর আসরে মাঝে মাঝে তাদের রাজকাহিনী গাইতে হয়। তার আগে তালিম নেবার সময় রাজাদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব জানিয়ে দেয় কামেশ্বর। তাতে সুবিধা হয়; পরিবেশটা মনের ভেতর থাকলে ভাব ফুটিয়ে তোলা সহজ। সেই সময় রাজাদের বাড়িঘরের বিবরণ দিয়েছে কামেশ্বর। সেই বর্ণনাটা মনে ছিল। ছিবলি দেখল, সেটার সঙ্গে তাঁবুর ভেতরটার আশ্চর্য মিল। লাল সাটিনের চাঁদোয়ার তলায় ধবধবে ফরাস পাতা। তাকিয়া-বালিশ চমৎকার ভাবে সাজানো। ফরাস থেকে ভুর ভুর করে আতরের গন্ধ আসছে। ফুলদানি, ধূপদানি, রুপোর ফরসি—কত রকমের শৌখিন বাহারে জিনিসই না চারদিকে ছড়িয়ে আছে!

শিউপূজনের পরনে লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবি আর ঢোলা পা-জামা। চোখের কোলে সরু রেখায় সুর্মার টান। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল সযত্নে আঁচড়ানো। নিখুঁত কামানো মুখ, চোখ লালচে। প্রচুর সুগন্ধি ঢেলেছে জামাকাপড়ে; গা থেকে উগ্র মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে।

শিউপূজন ছিবলিকে ফরাসে নিয়ে বসাল। তারপর আগের মত উচ্ছ্বাসের সুরেই বলল, 'এত দিন পর তবে দয়া হল ?'

'দয়া !'

'না তো কি। রোজই বল, আসবে। রোজ আশায় আশায় থাকি ; আসো আর না। আসব বলার কত দিন পর এলে বল তো ?'

অস্ফুট গলায় কি একটা কৈফিয়ৎ দিল ছিবলি, নিজেই তা বুঝতে পারল না।

খানিক দূরে ফরাসের আরেক প্রান্তে বসতে বসতে শিউপূজন বলল, 'তারপর বল কী খাবে ?'

'না-না, এখন কিছু খাব না।'

'তাই কখনো হয়। পয়লা দিন তুমি আমার তাঁবুতে এলে, একটু কিছু না খেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

'তা হলে যা খুশি আনান।' চোখ নামিয়ে সলজ্জ ফিস ফিস গলায় বলল ছিবলি।

শিউপূজনের একজন খাস চাকর আছে। তাকে দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পেঁড়া, লাড্ডু, সমোসা, নিমকি, কচৌরি আনাল সে, আর আনাল চা।

বড় চীনামাটির থালায় খাবারগুলো আধাআধি ভাগ করে চাকরটা একটা থালা দিল ছিবলিকে, অন্যটা শিউপূজনকে।

ছিবলি খাদ্যের পরিমাণ দেখে আঁতকে উঠল, 'ওরে বাবা, এত কে খাবে ?'

'তুমি।'

'উঁহু-উঁহু, এত আমি খেতে পারব না।'

'সরমাতে (লজ্জা করতে) হবে না ; তুমি খাও দিকি। একান্তই যদি খেতে না পারো না হয় পড়ে থাকবে।'

'নষ্ট হবে ?'

'হয় হবে ; ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এখন খাওয়া শুরু

কর দিকি।’

খেতে খেতে গল্প চলতে লাগল। ছিবলির কে কে আছে, তার বংশ-পরিচয় কী, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক খবর জেনে নিল শিউপূজন। ছিবলির প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, মা-বাপ ছাড়া তার আর কেউ নেই। বিয়েও করে নি। ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনায় ঝোঁক ছিল, সেটা মা-বাবার খুবই অপছন্দ। তা সত্ত্বেও গান-বাজনা চালিয়ে গেছে। তারপর বড় হয়ে যখন নৌটঙ্কীর দলে নাম লেখাল, মা-বাবা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করে বাড়ি থেকে বার করে দিল। সেই থেকে বয়েল গাড়িতে চড়ে এ গঞ্জ থেকে সে গঞ্জ, এ বাজার সে বাজারে, এ মেলা থেকে সে মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ছিবলি বলল, ‘সেই যে নৌটঙ্কীর দলে এসেছিলেন, আর বাড়ি ফেরেন নি?’

শিউপূজন বলল, ‘না।’

‘বাপ-মা’র সঙ্গে আর দেখা হয় নি?

‘না।’

‘বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না?’

‘না।’ উদাস গলায় শিউপূজন বলতে লাগল, ‘নৌটঙ্কীর দলে থেকে থেকে এমন হয়ে গেছে যে এখান থেকে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া—’

‘কী?’ ছিবলি উন্মুখ হল।

‘মা-বাপ তো আমাকে ত্যাজ্যই করেছে।’

ছিবলি কিছু বলল না এবার; শিউপূজনের জন্য মনের ভেতর বিষণ্ণ একটু সমবেদনা অনুভব করল।

শিউপূজন হঠাৎ হেসে উঠল, ‘যাক গে ও সব কথা, ও নিয়ে আবার মন খারাপ করে বসে থেকো না। যা চুকে গেছে তা গেছেই।’

ছিবলি বলল, ‘আপনি সাদি করেছেন?’

‘ঐ কাজটা করার সময় পেলাম কই।’ শিউপূজন হাসল।

এর পর এলোমেলো অসংলগ্ন অনেক কথা হল। শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা পাড়ল ছিবলি। হাত কচলে খানিক ইতস্তত করে বলল, 'আপনার কাছে যে এসেছি তার পেছনে কিন্তু আমার একটা স্বার্থ আছে।'

'স্বার্থ!'

'জী।'

'কী ব্যাপার খুলে বল তো।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল শিউপূজন।

ছিবলি বলল, 'আপনাকে আমার গুরু করে নিতে চাই।'

বুঝতে না পেরে ঈষৎ বিমূঢ়ের মত শিউপূজন জিজ্ঞেস করল, 'গুরু! আমাকে!'

'জী। আপনি আমাকে নাচ-গান দেখিয়ে দেবেন।'

শিউপূজনের চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনের ভেতর গহন কুটিল পথে দুরন্ত গতিতে কি যেন সঞ্চরণ করতে লাগল। মুঠি খুলে সবটুকু না দেখিয়ে খানিক ঢেকে খানিক রেখে, মুখখানা যতখানি সম্ভব নিস্পৃহ করে বলল, 'তুমি নিজেই তো চমৎকার নাচতে গাইতে জানো, আমি আর কি দেখাবো।'

'ছাই নাচতে-গাইতে জানি। আপনি যদি একটু দেখিয়ে দ্যান আমি এর চাইতে অনেক ভাল নাচতে-গাইতে পারব।'

'তোমার যখন এত ইচ্ছে তখন এসো।'

'কখন এলে আপনার সুবিধে হবে?'

'তুমি যখন আসবে তখনই আমার সুবিধে; তোমার জন্যে আমার দুয়ার সব সময় খোলা।'

'আমি কিন্তু রোজ একবার করে আসব।'

'একবার কেন, যতবার ইচ্ছে ততবার আসবে।'

পরের দিন থেকে খাওয়া-দাওয়া-স্নান-ঘুম এবং আসরে গাইতে ওঠার ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই শিউপূজনের তাঁবুতে আসতে শুরু করল ছিবলি। শিউপূজনও যত্ন করে তাকে গান এবং নৃত্যকলায়

দুরূহ কৌশলগুলো শেখাতে লাগল।

প্রতিদিন যাওয়া-আসার ফল হল এই, ভয়টা কেটে যেতে লাগল ছিবলির। কার সঙ্গে কী করেছে শিউপূজন ছিবলি ঠিক জানে না; কোন প্রমাণও তার হাতে নেই। তবে এ ব্যাপারে অসংখ্য ভীতিকর জনশ্রুতি তার কানে এসেছে।

অন্যের সঙ্গে যা খুশি করুক, ছিবলির সঙ্গে শিউপূজনের ব্যবহারের ভেতর ভয়াবহ কিছুই নেই। তা একেবারেই ত্রুটিশূন্য, সবরকম নোংরামি থেকে মুক্ত। কাজেই নানা রটনা শুনে শিউপূজনের যে ভয়ঙ্কর মূর্তিটা সে মনে মনে গড়ে তুলেছিল সেটা একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নির্ভয়ে শিউপূজনের কাছে এখন যাতায়াত করে ছিবলি। এই সত্যিকার গুণী লোকটা সম্বন্ধে আজকাল রীতিমত শ্রদ্ধার ভাব জেগেছে তার মনে।

কিন্তু শিউপূজন সম্বন্ধে ছিবলির ধারণাটা খুব বেশিদিন অটুট রইল না; তার শ্রদ্ধা আকর্ষণ মোহ—সমস্ত কিছু কাচের বাসনের মত একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

শিউপূজনের সঙ্গে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা হবার পর তারা এক জায়গায় বসে ছিল না। নানা জায়গায় যথারীতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ঘুরতে ঘুরতে এখন তারা এসেছে দক্ষিণ বিহারের একটা বড় গঞ্জে। একটানা দু সপ্তাহ গাইবার পর আজ তাদের গান বন্ধ হল।

মাঝখানে রাত্রিবেলাটা বিশ্রাম নিয়ে কাল তারা অন্য গঞ্জের দিকে পাড়ি জমাবে।

যাই হোক সন্ধ্যের দিকে শিউপূজনের তাঁবুতে এল ছিবলি। ভেতরে পা দিয়েই তার মনে হল, আবহাওয়াটা যেন অন্য দিনের মত নয়।

দেখা মাত্র শিউপূজন ডাকল, 'আও, আও দিলওয়ালী—' তার কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বাসময় কিন্তু জড়ানো।

শিউপূজনকে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছে ছিবলি ; ওটা তার স্বভাবের অঙ্গ। শিউপূজনের চরিত্রের এই দিকটার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কাজেই এ সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও চলে। কিন্তু তার জড়িত কণ্ঠস্বর ছিবলিকে চকিত করে তুলেছে।

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে শিউপূজনের দিকে তাকাল ছিবলি ; শিউপূজনের চোখ তুটি আরক্ত ; ঢুলুঢুলু। তার ঠোঁটে কেমন যেন একটা হাসি ফুটে রয়েছে আর মুখ থেকে ভক ভক করে উগ্র মিষ্টি গন্ধ আসছে। নিশ্চয়ই লোকটা নেশা করেছে।

ছিবলির বুকের ভেতর থেকে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলল, 'পালিয়ে যা ছিবলি, বাঁচতে হলে পালিয়ে যা।'

বুকের ভেতর থেকে নির্দেশ এল বটে, তবু পালাতে পারল না ছিবলি। কেউ যেন তার পা তুটো মাটিতে পুঁতে দিয়েছে।

তার মুখ দেখে কি বুঝল শিউপূজন, সে-ই জানে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কি, ডর লাগছে ?'

ছিবলি নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি স্থির, নিষ্পলক। অনুভব করল হৃৎপিণ্ডের ওপর অসহ্য থরথরানি ভর করেছে।

শিউপূজন আগের মতই জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'কুছু ডর নেই, কুছু ডর নেই, আও—' বলে হাত ধরে ছিবলিকে টেনে ফরাসে নিয়ে গেল।

নিজের হাতখানা ছাড়াতে চেষ্টা করল ছিবলি, পারল না। কঠিন মুঠিতে সেটা ধরা রয়েছে।

কাঁপা গলায় ছিবলি বলল, 'ছাড়ুন।'

'নহী, ছাড়ব কেন ?' একরকম জোর করেই ছিবলিকে ফরাসের ওপর বসিয়ে দিল শিউপূজন।

ছিবলি বলল, 'আমি আজ চলি।'

'যাবে কেন ?'

ছিবলি চুপ ; ভয়ের কথাটা সে বলতে পারল না।

শিউপূজন আবার বলল, 'গান শিখবে না ?'

'আজ থাক।' খুব আস্তে করে ছিবলি বলল।

'থাকবে কেন ?'

ছিবলি উত্তর দিল না।

'কি, মুখ বুজে রইলে কেন ? বল—'

অনেক পীড়াপীড়ির পর ছিবলি বলল, 'আপনার তবিয়ত আজ আচ্ছা নেই—'

হঠাৎ কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে জোরে জোরে প্রবলবেগে হেসে উঠল শিউপূজন। হাসির তোড় কিছু কমলে বলল, 'কে বললে আমার তবিয়ত আচ্ছা নেই ?'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে।'

'আমার কী দেখে মনে হচ্ছে ?'

'আপনার আঁখ।'

'আমার আঁখে কী হয়েছে ?'

'খুনের মত ও দুটো লাল।'

আগের মত আবার জোরে জোরে হেসে উঠল শিউপূজন।

ভয়ে ভয়ে ছিবলি বলল, 'হাসছেন কেন ?'

'তোমার কথা শুনে। তুমি ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ। আমার আঁখ কেন লাল হয়েছে বুঝতে পারছ না ?'

বুঝেও না বোঝার ভান করল ছিবলি, 'জী, নহী।'

'আমি দারু (মদ) খেয়েছি পিয়ারী, দারু খেয়েছি। তাই আঁখ অয়সা দেখাচ্ছে।'

ছিবলি স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই নৌটঙ্কী দলে কেউ বেলপাতা শুঁকে থাকে না। সবাই নেশাসক্ত, নারী সম্বন্ধে তাদের লোলুপতা অন্তহীন।

কিন্তু এতদিন শিউপূজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছুই পায় নি ছিবলি। প্রায় দু'মাসের ওপর সে যাতায়াত করছে

শিউপূজনের তাঁবুতে ; এমন কোন ইঙ্গিত শিউপূজন তাকে ছায় নি যাতে তার প্রতি মন বিমুখ হযে উঠতে পারে। কোনদিন নেশায় চোখ ঢুলুঢুলু করে এমন ভীতিকর আবহাওয়াও সে তৈরি করে রাখে নি।

গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে আলজিভের কাছটায় একরাশ খরখরে ধাবাল বালি যেন ছড়িয়ে আছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে ছিবলির। সারা জীবন তো পথে পথেই ঘুবছে সে ; ভালোমন্দ কত লোকের সংস্পর্শেই না এসেছে। কিন্তু এমন বিপজ্জনক অবস্থায় আগে আর কখনও পড়ে নি।

ছিবলি বলল, 'আমি আজ যাই।'

'নহী—' জোরে জোবে মাথা ঝাঁকাল শিউপূজন, 'গানা গাইবে না ?'

'না।'

'তাই কখনো হয়। ধবো আমাব সঙ্গে—"মেরে জীওনমে আয়া এক আজনবী— আজনবী—আজনবী"—'

বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ছিবলি কোনরকমে বলতে পারল, 'আপনার পায়ে পড়ি, আজ আমায় যেতে দিন।'

'নহী ; গানা না হলেও যেতে পারবে না।'

সভয় বিস্ময়ে ছিবলি বলল, 'গানা না হলে থেকে কি করব ?'

শিউপূজন বলল, 'আজ সারারাত তুমি আমার কাছে থাকবে।'

বিদ্যুতের রেখার মত তীব্র গতিতে উঠে দাঁড়াল ছিবলি। বলল, 'কী বলছেন আপনি !'

তাঁবুর বাইরে যাবার পথটা আগলে ধরে শিউপূজন হাসল ; নেশায় আরক্ত তার চোখ দুটিতে আদিম অরণ্য যেন ছায়া ফেলল।

তিন পা পিছিয়ে গেল ছিবলি ; এই শিউপূজনকে সে চেনে না। দু মাস ধরে যার কাছে নিয়মিত সে হাজিরা দিচ্ছে—সেই গুণী সংযত সহৃদয় মানুষটির সঙ্গে এর আদৌ কোন মিল নেই। ছিবলির সমস্ত

সত্তা শিউরে উঠল।

শিউপূজন বলল, 'ছ মাস ধরে গানা শেখাচ্ছি, বাজনা শেখাচ্ছি— সে কি এমনি এমনি! তার দাম নেবো না? একটা রাত আমার তাঁবুতে কাটালে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে পিয়ারী?'

এতদিনে শিউপূজনের মতলবটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যে অভিসন্ধিটা ছিল গুহাগোপন, নেশার ঘোরে একটানে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে সে।

ষড়যন্ত্রটা করেছিল ভালই। শিউপূজন জানত, ছিবলি চুহা নয়, আমিনা নয়, লাখপতিয়া অথবা রামপিয়ারী নয়। তার জন্য, তার জন্য কেন, কোন পুরুষের জন্যই—তা সে যে-ই হোক, রূপবান আর গুণবান—ছিবলির লালা ঝরে না। হাতছানি দিলেই লোভী কুকুরীর মত সে ছুটে আসবে না। তাই সংযমের মুখোসটি পরে মেপে মেপে পা ফেলে ছিবলির দিকে এগিয়েছে শিউপূজন। তার ফল হয়েছিল চমৎকার; ছিবলির প্রাণে নিজের সম্বন্ধে খুব ভালো একটা ধারণা এঁকে দিতে পেরেছিল। যে ভাবে চলছিল সে ভাবে আর কিছুদিন চললে ছিবলি হয়ত নিজেই তার কাছে ধরা দিত। কিন্তু অতখানি ধৈর্য নেই শিউপূজনের। জোর করে সংযমের যে আবরণটি সর্বাঙ্গে এঁটেছিল সেটা ছিঁড়ে ভেতর থেকে তার সত্যিকার আদিম লুব্ধ কামাতুর স্বরূপটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ছিবলি বলল, 'আপনি যে এত খারাব, এত বদমাশ তা জানতাম না।'

খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল শিউপূজন, 'জানতে না, এখন জানো।' বলে এক পা এক পা করে ছিবলির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ছিবলি তীব্র চাপা গলায় বলল, 'নহী।'

'বার বার নহী নহী করছ কেন পিয়ারী—'

অনেক কাছে এসে পড়েছে শিউপূজন। ছিবলি পিছু হটতে

লাগল। হটতে হটতে এমন একটা জায়গায় এসে পড়ল যেখান থেকে আর পেছুনো যায় না।

ছিবলির পিঠটা তাঁবুর দেয়ালে ঠেকেছে। তার মুখোমুখি বাঘের মত ওত পেতে দাঁড়িয়েছে শিউপূজন। যে কোন মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে পড়বে।

কিন্তু ছিবলিও পথের মেয়ে; ঘরের কোণের ললিত লবঙ্গলতাটি নয়। চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে হঠাৎ কোথা থেকে দুর্জয় খানিকটা সাহস সংগ্রহ করে ফেলল সে। কঠিন গলায় বলল, 'যেতে দিন, নইলে ভাল হবে না।'

'কী করবে শুনি?'

'চেঁচাব।'

'চেঁচিয়ে লাভ হবে না। সবাই ছুটে হয়ত আসবে কিন্তু আমাকে কিছু করতে পাবে এমন সাহস এ দলের কারো নেই। কামেশ্বরেরও না।' বলে ছিবলির একটা হাত ধরে প্রবল বেগে নিজের দিকে টানল শিউপূজন।

অতর্কিত টানে শিকড় ছেঁড়া একটা গাছের মত শিউপূজনের বুকের ওপর এসে পড়ল ছিবলি। পরক্ষণেই নিজেকে মুক্ত করে ছিটকে দূরে সরে গেল। তারপরেই প্রাণফাটানো চিৎকার করে উঠল, 'বাপু-উ-উ-উ, শীগ্‌গির এসো। আমার সর্বনাশ করে ফেলল।' এই মুহূর্তে অন্ধ ধনপত ছাড়া আর কারো কথা মনে পড়ল না ছিবলির।

এদিকে শিউপূজন আবার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ফুলদানি হাতের কাছে পেয়ে গেল ছিবলি। চকিতে সেটা তুলে নিয়ে অন্ধের মত শিউপূজনের কপালে ছুঁড়ে মারল। কপালে হাত চেপে অস্ফুট কাতর শব্দ করে বসে পড়ল শিউপূজন। আর চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল ছিবলি।

মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখেছিল শিউপূজন। তারপরেই

একটা লাফ দিয়ে তাঁবুর বাইরে এল। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তার আর হয় নি। মেয়েমানুষ চিরদিনই শিউপূজনের কাছে সহজলভ্যা। তার একটু অনুগ্রহের জন্য নৌটঙ্কী দলের মেয়েরা উন্মুখ হয়ে থাকে ; সামান্য ইশারাটুকুর শুধু অপেক্ষা ; ঝাঁক বেঁধে তারা ছুটে আসবে। মেয়েমানুষের জন্য কোনদিনই তাকে সাধ্যসাধনা করতে হয় নি।

কিন্তু এই মেয়েটা—ছিবলি ? তার জন্য শিউপূজনের যা স্বভাব-বিরুদ্ধ, সেইভাবে সাধনা শুরু করেছিল সে। কিন্তু ক'দিন আর। শিউপূজনের ধৈর্য অফুরন্ত নয়। সহিষ্ণুতা খুবই ক্ষণস্থায়ী। আজ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি সে। সব রকম ভব্যতা, মাধুর্য আর সংযম ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে তার আদত স্বরূপটা আজ বেরিয়ে এসেছে।

একটু যদি ধৈর্য ধরত শিউপূজন হয়ত ছিবলি ধরা দিত কিন্তু তর আর সয় নি তার। ফল হয়েছে এই, ছিবলিকে পাওয়া তো গেলই না, যা পাওয়া গেল তা হল কপালে ফুলদানির আঘাত।

আঘাতটা খুব যে একটা সাঙ্ঘাতিক তা নয়। কিন্তু এ নিদারুণ অমর্যাদা, শিউপূজনের পৌরুষের পক্ষে চূড়ান্ত অসম্মান। মেয়েমানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যর্থ হবে, এমন অভিজ্ঞতা তার কিন্নর জীবনে আর কখনও হয় নি।

কাজেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে শিউপূজন। অন্ধের মত উন্মত্তের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত ছিবলির পিছু পিছু ছুটতে লাগল সে।

ছিবলিও ছুটছে আর সমানে চিৎকার করছে, 'বাপু—বাপুজী—ই-ই-ই। কে কোথায় আছ বাঁচাও—বাঁচাও—'

চেঁচামেচিতে অন্য তাঁবু থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়েছে ; কামেশ্বর ছুটে এসেছে। লাঠি ঠক ঠক করে উদ্‌ভ্রান্তের মত ধনপতও এসেছে। ধনপত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাই পাগলের মত সে শুধু চেঁচাচ্ছে, 'কি হয়েছে ছিবলিয়া--কি হয়েছে বেটি—'

এ দিকে সবাই শিউপূজনকে ধরে ফেলেছে। ছিবলি ছুটে গিয়ে

তার অন্ধ বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুঞ্জনে চিৎকারে নৌটঙ্কী দলের লোকগুলো এখন মুখর, উত্তেজিত।

তাড়া-খাওয়া ভীরু প্রাণীর মত ছিবলি কেন অমনভাবে ছুটে এসেছে, কেন শিউপূজনের কপাল রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত—সব কথা জানতে চায় লোকগুলো। সবার হয়েই যেন দলের মালিক কামেশ্বর প্রশ্নটা করল, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

শিউপূজন কিছু বলল না; হাতে-পায়ে-বেড়ি-পরা একটা শ্বাপদের মত জ্বলন্ত হিংস্র চোখে সে শুধু তাকিয়ে আছে আর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে।

সংক্ষেপে সব কথা জানিয়ে তীক্ষ্ণ উত্তেজিত স্বরে ছিবলি বলল, 'একটা জানোয়ার, কুত্তা। হারমী কাঁহিকা—'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে কামেশ্বর শিউপূজনকে বলল, 'এ বহুত বুরা বাত, বহুত বুরা বাত। তোমার কাছে এ আমি আসা করিনি শিউপূজনজী—'

ছিবলি বলল, 'শর্মাজী, আপনি দলের মালিক। আপনাকে এর বিচার করতে হবে।'

'জরুর-জরুর।'

শিউপূজন হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, 'বিচার করবে! কোন শালা শুয়ারকা বাচ্চার বিচার আমি পরোয়া করি না।'

কামেশ্বর বলল, 'তুমি অন্যায় করবে আবার খিস্তিও করবে, চোখও রাঙাবে।'

'অন্যায়টা কী করেছি?'

'জিজ্ঞেস করতে সরম হয় না।'

'কিসের সরম, বলি সরমটা কিসের—' যারা ধরে রেখেছে তাদের ঠেলে ধাক্কা মেরে কামেশ্বরের দিকে ছুটে যেতে চাইল শিউপূজন; পারল না অবশ্য। পারল না বলে দ্বিগুণ ক্ষেপে উঠল, 'তুই কি আন্ধা! জানিস না নৌটঙ্কী দলের সব মাগী রেণ্ডিবাজি করে বেড়ায়!'

ছিবলিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ শালী স্বর্গের সতী নাকি ? এতই যদি সতীপনা তা হলে নৌটঙ্কী দলে কেন ?'

শিউপূজনের কথাগুলো আগুনের হল্কার মতন গায়ে এসে লাগল যেন। ছিবলি চেঁচামেচি বাধিয়ে অভিশাপ দিতে লাগল, 'হারামী কুত্তা, তোকে সাপে ছোবলাবে, তোর মাথায় বাজ পড়বে। গলায় রক্ত উঠে তুই মরবি।'

অন্ধ ধনপত গালাগাল দিতে লাগল। অবশ্য শিউপূজন মুখ বুজে রইল না। দু তরফে খানিকটা অশ্লীল অকথ্য ভাষার আদান-প্রদান হয়ে গেল।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-দিকে দু হাত তুলে যুদ্ধরত দু দলকে চিৎকার করে প্রথমে থামিয়ে দিল কামেশ্বর, 'চোপ, একদম চোপ। চিল্লাচিল্লি বন্ধ কর।' খেউড়ের স্রোত স্তিমিত হয়ে এলে শিউপূজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ চলবে না।'

কুটিল চোখে কামেশ্বরকে দেখতে দেখতে শিউপূজন বলল, 'কী ?'

'ছিবলি যখন চায় না তখন তার পেছনে তুমি লাগতে গেলে কেন ?'

'সে কৈফিয়ৎ তোর কাছে দেব না কি রে শালা ?'

'খিস্তি কোরো না। আমি যখন দলের মালিক তখন দিতে হবে বৈকি।'

'না, দেব না। যা পারিস তুই কর—'

অন্য কেউ হলে নাগরা চালিয়ে অনেক আগেই সিধে করে দিত কামেশ্বর। শিউপূজনের এই উগ্র মেজাজ আর কুৎসিত জঘন্য ব্যবহার যে তাকে প্রায় নীরবে হজম করতে হচ্ছে তার একমাত্র কারণ শিউপূজনের মত গুণী গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে নৌটঙ্কীর জগতে দুর্লভ। সে চটে গেলে ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

কামেশ্বর বলল, 'শুধু শুধু রাগারাগি করছ কেন ? তুমি বাপু শির ঠাণ্ডা করে একবার ভেবে ছাখো কী কাণ্ডটা বাধিয়েছ।'

কিছু না বলে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল শিউপূজন।

একটু ভাবল কামেশ্বর। ছিবলিকে চটানোও কোন কাজের কথা নয়। ভাল পুরুষ গাইয়ে যদিও মেলে, মনের মত কিন্নরী পাওয়া অসম্ভব। ছিবলি চলে গেলে দল কানা হয়ে যাবে। অতএব মাঝামাঝি একটা রফার উদ্দেশে সে বলল, 'বলছি কি, ছিবলির কাছে দোষটা স্বীকার করে নাও, মিটমাট হয়ে যাক। তারপর তুমি তোমার মনে থাকো, ছিবলি ছিবলির মনে থাকুক। আসরে উঠে গান টান গাওয়া ছাড়া কারো সঙ্গে কারো কথা বলার দরকার নেই।'

ক্রুদ্ধ পশুর মত গর্জে উঠল শিউপূজন, 'নহী—'

'কী নহী ?'

'তুই শালে চুহাকে গুলাম, আমাকে ঐ ছুঁড়ির কাছে ক্ষমা চাইতে বলছিস ? তা আমি পারব না। জান গেলেও না।'

অনেকক্ষণ সহ্য করেছে কামেশ্বর ; এবার তার ধৈর্য শেষ সীমারেখা পেরিয়ে গেল, 'দোষ করবে আর ক্ষমা চাইবে না ? চাইতেই হবে। আমার দলে কারো কোনরকম বেয়াদপি সহ্য করব না।'

বারুদের স্তূপে আগুনের ফুলকি এসে লাগল যেন। মাটিতে পা ঠুকে গলা ফাটিয়ে লাফালাফি করতে লাগল শিউপূজন, 'তোর দলে কোন শালা থাকতে চায় ; থাকব না—থাকব না—থাকব না। দলের মাথায় তিন লাথ মেরে দশবার থুক দিয়ে আমি চলে যাব।'

উত্তেজনার ঝোঁকে কি বলে ফেলেছে, খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই কামেশ্বর চমকে উঠল, 'আহা আমি তোমার চলে যাবার কথা বললাম নাকি ?'

'শালে তোর কোন কথা শুনতে চাই না ; আমি যাবই।' যারা ধরে রেখেছিল তাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল শিউপূজন।

এত উত্তেজনা, চিৎকার, গালিগালাজ এবং খেউড়ের ভেতর হঠাৎ ছিবলির চোখে পড়ল তাঁবুগুলো থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফুলনরাম। আজ আর তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছিবলির মুখে নিবদ্ধ নয় ;

পৃথিবীর সবটুকু ঘৃণা রাগ এবং আগুন দু চোখে পুঞ্জীভূত করে একদৃষ্টে শিউপূজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফুলনরাম।

প্রথমটা অবাক হয়ে গেল ছিবলি। শিউপূজনের ওপর এত বিরূপতা কেন ফুলনরামের? পরক্ষণেই বিদ্যুৎচমকের মত তার মনে হল, তবে কি তার সঙ্গে শিউপূজন যে ব্যবহার করেছে সেই জন্যই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ফুলনরাম? ছিবলির বুকের ভেতর অস্পষ্ট ভাবে কে যেন বলতে লাগল, হয়ত—হয়ত—। সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে বিচিত্র এক থরথরানি অনুভব করল সে।

এদিকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তাঁবুর দিকে চলে গেল শিউপূজন; তার পিছু পিছু কামেশ্বরও গেছে। অনেক অনুনয় বিনয়, হাতে-পায়ে ধরাধরি করল কামেশ্বর কিন্তু শিউপূজনকে ধরে রাখা গেল না; তখনই সে দল ছেড়ে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

দেখতে দেখতে আরো ক'মাস কেটে গেল।

শিউপূজনের জায়গায় নতুন গায়ক যোগাড় করেছে কামেশ্বর। দল চালাতে হলে যোগাড় না করে উপায়ই বা কি।

এদিকে যত দিন যাচ্ছে ছিবলির খ্যাতির দিগন্ত ততই বেড়ে চলেছে। গোপনে গোপনে অন্য দল থেকে লোভনীয় সব প্রস্তাব আসতে লাগল।

কামেশ্বর দু-জনের খোরাক-পোশাক ছাড়া দেড় শ' টাকা করে মাইনে দিচ্ছিল। মীরজাপুরের একটা দল এক শ' ষাট দিতে চাইল। রলহনগঞ্জের একটা দল অঙ্কটা বাড়িয়ে পৌনে দুশ'য় তুলল। নৈনীর একটা দল তুলল আড়াই শ'য়।

সব চাইতে চড়া দর দিল নবলগঞ্জের একটা দল।

তখন ছিবলিরা চম্পারণের এক মেলায় গাইতে এসেছে। জায়গাটা রুখাশুখা, জলের খুবই অভাব। স্নানের জন্য মেলা থেকে অনেকখানি দূরে একটা ছোট নদীতে যেতে হত। নদী আর কি ; স্রোত নেই বললেই চলে। চারদিক থেকে বালির ভাঙা এগিয়ে এসে তার শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলেছে। সোনালী বালির ফাঁকে ফাঁকে চিকচিকে জল—নদী বলতে এই।

একদিন স্নান সেরে নদী থেকে তাঁবুতে ফিরে আসছে ছিবলি, একটা লোক পিছু নিল। প্রথমটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ছিবলি। চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে কিন্তু লোকটা পিছু ছাড়ল না।

ছিবলি যখন দেখল তাকে এড়ানো যাবে না তখন ঘুরে দাঁড়াল। ভয় পেয়ে পালালে পেয়ে বসবে ; তার চাইতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধই ভাল।

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝাল সুরে ছিবলি বলল, 'তখন থেকে পিছু নিয়েছ কেন? কী মতলব ?'

লোকটার শুকনো দড়ি-পাকানো চেহারা, ছটফটে ধারাল চোখ, বাঁকানো নাক, চুমড়ানো গোঁফ—সব মিলিয়ে মনে হয় সে সহজ নয়। ছিবলির মনোভাব লোকটা বোধ হয় বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বলল, 'খারাপ কোন মতলব নেই ছিবলিজী—'

তার নামও জানে দেখা যাচ্ছে। সন্দেহে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল ছিবলির, 'আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে ?'

চোখ নাচিয়ে বিনীত গদগদ ভাব করে লোকটা বলল, 'বিহার উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ—সারা হিন্দোস্তানের কে আপনার নাম জানে না শুনি। আপনাব মত গাইয়ে-নাচিয়ে কলাওতী (কলাবতী) সারা দেশে নেই।'

নাম জানার কারণটা বোঝা গেল। কিন্তু গদগদ ভাবে ভুলল না ছিবলি। সতর্ক থেকে নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলল, 'আমার কাছে কী চান ?'

'কোথাও বসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

একমুহূর্ত ভেবে নিল ছিবলি। বলল, 'বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।'

'কোথায় ?'

'আমি এখন যেখানে আছি।'

'চলুন।'

লোকটার যদি খারাপ কোন অভিসন্ধি থেকে থাকে তাঁবুতে গেলে সুবিধে করতে পারবে না। ছিবলির ইঙ্গিত পেলে দলের লোকেরা তার হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলবে।

লোকটা সত্যি সত্যিই যখন তার সঙ্গে আসছে তখন হয়ত খারাপ মতলব না থাকতেও পারে। ছিবলি বলল, 'অনেকটা পথ কিন্তু যেতে হবে।'

'জানি ; ঐ মেলা পর্যন্ত।' লোকটা বলল।

সব খবরই রাখে দেখা যাচ্ছে। ছিবলি বলল, 'আপনি কী করেন ?'

'আমার নাম মনোহরলাল ; নবলগঞ্জের নৌটঙ্কী দলের নাম শুনেছেন ছিবলিজী ?'

নবলগঞ্জের দল বিখ্যাত দল ; সারা আর্যাবর্ত জুড়ে তার নাম-ডাক। একটু চকিত হল ছিবলি 'শুনিনি আবার ! নবলগঞ্জের দলের নাম এ লাইনের কে না শুনেছে !'

হাওয়াটা অনুকূলই মনে হচ্ছে। লোকটা উৎসাহের সুরে বলল, 'আমি ঐ দলে হারমানি (হারমোনিয়াম) বাজাই ; আমার নাম সীতা কাহার।'

একটু পর তাঁবুতে পৌঁছে ধনপতের সঙ্গে সীতা কাহারের আলাপ করিয়ে দিল ছিবলি। তারপর বলল, 'এবার আপনার দরকারের কথাটা বলুন।'

'আমাদের দলের মালিক আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে। তার ইচ্ছে আপনি আমাদের দলে আসুন।'

ধনপত বলল, 'এ তো খুব ভাল কথা ; নবলগঞ্জের দল এ দিকের সব চাইতে সেরা দল। সেখানে গেলে নামডাক আরো বাড়বে।'

সাতা কাহার বিগলিত স্বরে বলল, 'সে তো এক শ' বার। আমরা এমন ব্যবস্থা করব যাতে সারা হিন্দোস্তানের লোক ছিবলিয়াজীর নাম জেনে যাবে।'

নবলগঞ্জের দল থেকে আমন্ত্রণ আসা রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার। নৌটঙ্কী দলের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকারা ওখানে গিয়ে ভিড় করেছে।

কিছুদিন আগে হলে গলে যেত ছিবলি ; সীতা কাহারের প্রস্তাব শোনা মাত্র রাজী হয়ে যেত। কিন্তু ইদানীং সে হিসেব করতে শিখেছে ; কোন কিছু বিচার বা বিশ্লেষণ না করে নিছক আবেগের তোড়ে এখন আর ছিবলি ভেসে যায় না। নৌটঙ্কী দলে বছর খানেক কাটিয়ে জগতের অনেক কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন এক পা বাড়াতে গেলে তিন বার ভাবে ছিবলি ; কিশোরী বয়েসে যে আবেগ টলমল করত তাতে আজকাল উজানী টান লেগেছে।

ছিবলি বলল, 'বললেই তো যাওয়া হয় না। কিছুই কথাবার্তা হল না। হুট করে অমনি গেলেই হল!'

ইঙ্গিতটা বুঝল সীতা কাহার। বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ কথাবার্তা বলতে হবে বৈকি। আপনার যা বলবার বলুন।'

'আমি কী বলব! বলবেন তো আপনি।'

'তা বটে—' বলে একটু ভেবে সীতা কাহার শুরু করল, 'আপনি এখানে কি রকম তলব (মাইনে) পান?'

'দেড় শ' টাকা।'

'আমাদের মালিক দু শ' দিতে রাজী।'

'নৈনীর একটা দল দু শ' টাকা দিতে চেয়েছে। আমি যাই নি।'

'কত চান আপনি?'

'কত দিতে পারেন আপনারা?'

'আড়াই শ'।'

'নহী।'

'খানিকক্ষণ চিন্তা করে সাতা কাহার বলল, 'দু শ' পঁচাত্তর পর্যন্ত মালিক আমাকে উঠতে বলেছে। ঐ টাকাতেই দয়া করে রাজী হয়ে যান।'

'নহী।'

'তবে কত চান?'

'তিন শ রুপাইয়া পুরা দিতে হবে। তার ওপর খোরাক-পোশাক। আমার বাবার সব খরচ চালাতে হবে। এতে রাজী আছেন?'

সীতা কাহার বলল, 'আপনি যা যা বললেন, মালিকের কাছে গিয়ে বলব। মালিক রাজী হলে ও বেলা এসে বলে যাব।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'দয়া করে ও বেলা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। এর ভেতর যদি অন্য দল থেকে আসে কথা দিয়ে দেবেন না যেন।'

'তাই হবে।'

'নমস্তে।'

'নমস্তে।'

সীতা কাহার সত্যিসত্যিই বিকেল বেলা এসে হাজির। এক রকম লাফাতে লাফাতেই এসেছে সে। উচ্ছ্বসিত গলায় জানাল, তার মালিক ছিবলির প্রস্তাবেই রাজী। সম্ভব হলে আজ নতুবা কাল, ছিবলি যখন বলবে, সীতা কাহার এসে তাদের নিয়ে যাবে।

ছিবলি বলল, 'আপনি দুদিন পর এসে পাকা কথা নিয়ে যাবেন।'

'কথা তো পাকা হয়েই গেছে।' সীতা কাহারের মুখে ছায়া পড়ল, 'তবে আর সময় নিচ্ছেন কেন?'

'একটা ব্যাপারে সময় দরকার।'

সন্দিগ্ধ সুরে সীতা কাহার বলল, 'কী ব্যাপার?'

ছিবলি বলল, 'সে আছে।'

'এর ভেতর অন্য কোন দল এসেছিল নাকি?'

ছিবলি হেসে ফেলল, 'না-না, কেউ আসে নি। সে জন্যে আপনার ভাবনা নেই।'

'দেখবেন—'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ দল ছেড়ে অন্য কোথাও যদি যাই-ই, আপনাদের দলেই যাব। আর কোথাও না।'

'তা হলে দুদিন পর আসব?'

'তাই আসুন।'

সীতা কাহার বিদায় নেবার পর বাপের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল ছিবলি। বলল, 'তুমি কী বল বাপু?'

'আমি তো বলি এত টাকা আর কোন দল তোকে দেবে না। আমাব মতে নবলগঞ্জের দলে যাওয়াই উচিত।'

ছিবলি উত্তর দিল না।

ধনপত আবার বলল, 'টাকার জন্যে যখন নৌটঙ্কী দলে নাম লেখানো তখন যেখানে বেশি পাওয়া যাবে সেখানেই যেতে হবে। আজ চলে গেলেই ভাল হত, তুই আবার দুটো দিন সময় নিতে গেলি কেন?'

ছিবলি এবারও নিশ্চুপ।

ধনপত বলল, 'কী এত ভাবছিস?'

'ভাবছি শর্মাজীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। তাকে না জানিয়ে অন্য দলে যাওয়া ঠিক না।'

উচিত-অনুচিতের কড়ি ধারে না ধনপত। তার হিসেব পুরোপুরি স্বার্থের হিসেব। সে বলল, 'বলতে চাস, বল্। লকীন একটা কথা মনে রাখিস।'

'কী?'

'সুযোগ হামেশা আসে না। আর—'

'কী ?'

'শর্মাজীকে বললে তোকে ছেড়ে দেবে নাকি ? হাজার বাহানা করে তোকে আটকাতে চাইবে।'

বাপের মনোভাব বুঝতে অসুবিধে হল না ; দিনের আলোর মত তা স্পষ্ট, উলঙ্গ। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের প্রশ্নটাকে এখনও পর্যন্ত চেটেপুটে খেয়ে ফেলতে পারে নি ছিবলি। হয়ত সেটা তার স্বভাব কিংবা কাঁচা বয়েসের ধর্মই এই।

ছিবলি অকৃতজ্ঞ নয়, লোভনীয় দাম পেতেই যে চুপি চুপি পালিয়ে যাবে তেমন মনোভাব সে পোষণ করে না। যে লোক তাকে নৌটঙ্কীর জগৎ চিনিয়েছে, যাবার আগে সেই কামেশ্বরের কাছে জিজ্ঞেস করেই যাবে। হঠাৎ দল ছাড়লে কামেশ্বর খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। লোক যোগাড় করার মত সময় তাকে দেওয়া দরকার। সব দিক বিবেচনা করেই সে যাবে।

ছিবলি বলল, 'আটকাতে তো চাইবেই।'

ধনপত বিরক্ত হল, 'আর আটকাতে চাইলে তুই নিশ্চয়ই আটকে যাবি ?'

'শর্মাজীকে আমি বোঝাবো।'

'বুঝবার জন্যে সে বসে আছে।'

ধনপত অসন্তুষ্ট হল, রাগ করল। তবু ছিবলি নিজের স্বভাবের নির্দেশ অমান্য করতে পারল না। বাপের সঙ্গে পরামর্শ চুকিয়ে সন্ধ্যের আগে আগে কামেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'আপনার সাথ একটা জরুরী কথা আছে।'

'বল—' কামেশ্বর উদ্‌গ্রীব হল।

সংক্ষেপে সীতা কাহারের প্রস্তাবটা জানিয়ে ছিবলি বলল, 'আপনি কী বলেন ?'

নিমেষে মুখখানা কালো হয়ে গেল কামেশ্বরের। অনেক কষ্টে

নিষ্প্রাণ একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলল, 'এ তো খুব ভাল খবর। নবলগঞ্জের দলটার মত এত বড় দল এদিকে আর একটাও নেই।'

ছিবলি বলল, 'আপনি কী বলেন ?'

'কী ব্যাপারে ?'

'আমার ওখানে যাওয়ার সম্পর্কে।'

'আমি কী বলব বল ?'

'আপনিই তো বলবেন।'

অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে কামেশ্বর বলল, 'মানুষের জীবনে সুযোগ বার বার আসে না ছিবলি। আমি তোমাকে এ সুযোগ ছাড়তে বলি না।'

'বাপুও এই কথাই বলছিল।' ছিবলি বলল।

'তোমার বাপু একলা কেন, দুনিয়ার সবাই এই কথা বলবে।' কামেশ্বর বলতে লাগল, 'আমার দল নবলগঞ্জের দলের তুলনায় অনেক ছোট। তোমাকে দেড় শ' টাকা করে যে দিই তাতে আমার বেশ কষ্ট হয়। আমি জানি ওর চাইতে অনেক বেশি তুমি পেতে পার। আমার মতে নবলগঞ্জের দলে চলে যাওয়াই তোমার উচিত। ওখানে গেলে আরো বড় হবে তুমি, আরো নাম ছড়িয়ে পড়বে। তবে—'

'কী—'

'তুমি চলে গেলে আমার দলটা কানা হয়ে যাবে ; হয়ত দল তুলেই দিতে হতে পারে। আমার অনুরোধ—'

সাগ্রহে তাকাল ছিবলি, 'বলুন—'

কামেশ্বর বলল, 'তোমার মত পাব না জানি। তবু যদ্দিন না মোটামুটি একটা গাইয়ে-নাচিয়ে মেয়ে যোগাড় করতে পারছি তদ্দিন তুমি যদি থাকতে। অবশ্য জোর আমার নেই ; তবু—'

ছিবলি বলল, 'আপনি অন্য মেয়ে দেখতে থাকুন। যদ্দিন না পান আমি আপনার দল ছেড়ে যাব না, কথা দিলাম।'

'লকীন—'

'লকীন টকীন কিছু না। আপনি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে দলে জায়গা দিয়েছেন। আমার যা কিছু হয়েছে সব আপনার জন্যেই। আপনার অসুবিধে হয় ক্ষতি হয় তা আমি কিছুতেই করতে পারব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তোমার কির্‌পা—'

'কির্‌পা টির্‌পা বলে লজ্জা দেবেন না।'

একটু চুপ করে থেকে কামেশ্বর বলল, 'সামনে শোণপুরের মেলা ; এক মাস ধরে মেলাটা চলবে। মাত্র একটা মাস। তারপর নিশ্চয়ই তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'বেশ। ঐ কথাই রইল।'

দু'দিন পর সীতা কাহার এলে ছিবলি বলল, 'এক মাস পর আপনাদের দলে যাব।'

সীতা কাহার অবাক, 'সে কি! এই দু'দিন সময় নিলেন ; আবার বলছেন এক মাস।'

'হ্যাঁ, শোণপুরের মেলা শেষ হলে একবার খোঁজ নেবেন।'

'কিন্তু এত দেরি করলে—' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেল সীতা কাহার।

সীতা কাহারের গলায় এমন কিছু ছিল যাতে ঈষৎ বিরক্ত হল ছিবলি। একটু ঝাঁঝাল সুরেই সে বলল, 'দেরি করলে যদি অসুবিধে হয় আপনাদের দলে না হয় না-ই গেলাম।'

সীতা কাহার চকিত হয়ে উঠল, 'না-না, আমি এভাবে কথাটা বলি নি। শোণপুরের মেলার পরই আপনাকে নিতে আসব। আপনি কিন্তু আমার ওপর রাগ করতে পারবেন না।'

'আ রে না-না—' ছিবলি হেসে ফেলল।

'আপনাদের দল শোণপুর যাচ্ছে তা হলে?'

'জী।'

'আমাদের দলও যাচ্ছে। ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

হাসতে হাসতে সীতা কাহার বলল, 'শোণপুরের মেলার পর কিন্তু আমাকে ফেরাতে পারবেন না।'

'না, ফেরাব না।' ছিবলিও হাসল।

॥ সাত ॥

শোণপুরের মেলা।

গণ্ডকী আর গঙ্গা নদীর সঙ্গমে বিহারের এই মেলাটির তুলনা সারা আর্যাবর্তে—শুধু আর্যাবর্তে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজেও পাওয়া যাবে না। ভারতের এটি বৃহত্তম মেলা। চলেও দীর্ঘদিন ধরে ; মেয়াদ পুরো একটি মাস।

শোণপুরের মেলার আরেক নাম হরিহর ক্ষেত্রের মেলা। হাতী আর ঘোড়া বিকিকিনির বিশাল বাজার বসে বলে এর আরেক নাম হাতীঘোড়ার মেলা।

প্রতি বছরের মত এবারও শোণপুরের মেলায় এল কামেশ্বররা। বেশ কিছু আগে আগেই এল। মেলা জমতে এখনও কিছু দেরি।

একটু আগে এসে তাঁবু টাঙিয়ে সামিয়ানা খাটিয়ে বসতে পারলে অনেক সুবিধে। অবশ্য মেলায় জায়গা পাওয়া নিয়ে দুর্ভাবনা নেই। কেন না এক বছরের মেলা শেষ হতে না হতেই পরের বছরের জন্য জায়গা ইজারা করে রাখতে হয়। যখন হোক এলেই হল ; বন্দোবস্ত করা জমি পাওয়া যাবেই। কামেশ্বরদের জমি আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা আছে।

আগে আসার সুবিধেটা অন্যদিক থেকে। প্রথমত, মেলার লোকজন কেমন হবে এবং সেই অনুপাতে লাভের অঙ্কটা কি রকম

দাঁড়াবে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এক-আধটা দলই তো শোণপুরে আসে না; বিহার উত্তরপ্রদেশ সাফ হয়ে অগণিত দল আসে। অন্য দলগুলো কি ভাবে তৈরি হয়ে এসেছে, কোন চমকপ্রদ পালা নামিয়ে বাজিমাৎ করে দেবে কিনা—চর লাগিয়ে এ-সবের হদিস পেলে নিজেদের পালাগুলো মেজেঘষে পালিশ ফুটিয়ে অদল-বদল করে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

তা ছাড়া প্রচারের একটি দিক আছে। ইদানীং সেইটেই সব চাইতে বড় দিক। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে যে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে পারবে তারই দিগ্বিজয়। উট ভাড়া করে তার পিঠে মাইক তুলে হিন্দি ফিল্মের গান বিতরণের ফাঁকে ফাঁকে দল-সংক্রান্ত হ্যাণ্ডবিল বিলি করাই এ কালের রেওয়াজ। অনেকে আবার উট এবং হিন্দি গানের সদাব্রতে খুশি না। ক্লাউনের সাজে কারোকে সাজিয়ে লরীতে তুলে চারদিক ঘোরাতে ঘোরাতে হ্যাণ্ডবিলের হরিরলুট দেয়। মোট কথা মনোহরণ করা। আগে এসে যে যেমন জমি প্রস্তুত করে রাখতে পারবে তার তেমন সিদ্ধি, তার তেমন ফসল। অর্থাৎ আগে এলে এখানে বাঘে খায় না; সোনা মেলে।

এতকাল নৌটঙ্কী জিনিসটা কুলেশীলে বাঙলা দেশের যাত্রাপালার কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আজকাল তাতে নানারকম ভেজাল ঢুকতে শুরু করেছে।

একটি যৎসামান্য পালাকে ঘিরে নৌটঙ্কীতে থাকে প্রচুর নাচ, প্রচুরতর গান এবং হাস্যরসের জন্য অঢেল অপর্যাপ্ত ভাঁড়ামি; খাঁটি জনতার জিনিস।

এক বছর পর শোণপুরে এসে এবার খবর পাওয়া গেল, নৌটঙ্কীতে হিন্দি রুস্তমী ফিল্মের কিছু কিছু অনধিকার প্রবেশ ঘটে গেছে। অতএব নিশ্বাস ফেলার সময় রইল না কামেশ্বরের। হিন্দি ফিল্মের রগরগে মশল্লাদার বস্তুগুলো নিজেদের পালার ভেতর কায়দা করে

ঢুকিয়ে দিতে লাগল সে।

কামেশ্বররা যখন এসেছিল তখন চারদিকে সাড়া পড়ে নি। সবে মাত্র দশ বিশ খানা বয়েল গাড়ি কি ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা আসতে শুরু করেছে। নইলে মেলার বিশাল চত্বরটা প্রায় খাঁ-খাঁ করছিল।

পালা অদল-বদল করার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাণ্ড তাঁবু উঠল কামেশ্বরদের ; তার ভেতর ঝালব দেওয়া সমিয়ানা টাঙানো হল।

আর কামেশ্বরদের তাঁবু আর সমিয়ানা বসতে বসতে শোণপুরের মেলা সরগরম হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম সারাদিনে এক আধখানা বয়েল গাড়ি কি ঘোড়ায়-টানা টাঙ্গা আসছিল। এখন চারদিকে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে গাড়ির পর গাড়ি আসছে ; সারিবদ্ধ অসংখ্য অগণিত গাড়ি। দিনের বেলা তো আসছেই, রাতেও আসার বিরাম নেই।

শুধু কি বয়েল গাড়ি আর টাঙ্গাই, লরী-ট্রাক-জীপ—সব মিছিল করে আসতে শুরু করেছে। ফলে গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে এই সুবিপুল মেলাটার মাথায় সর্বক্ষণ ধুলোর মেঘ অনড় হয়ে আছে।

গাড়িগুলো আসছে আর যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় ক্ষিপ্র হাতে তাঁবু তুলে দোকান-পসার সাজিয়ে ফেলছে। তাঁবুতে তাঁবুতে আর দোকানে দোকানে সমস্ত জায়গাটা এখন ছয়লাপ।

কিন্তু এ সবই প্রস্তাবনা। দু-এক দিনের মধ্যে মানুষের ভিড়ে, চিৎকারে, হল্লায়, বিকিকিনিতে পুরো একমাসের মেয়াদে যে প্রমত্ত উৎসবটা শুরু হবে—এ হল তারই ভূমিকা। উপমা দিয়ে বলা যায়, ধ্রুপদ গানের আগে যে বিলম্বিত লয়ের আলাপ—এখন যেন তারই আলাপ চলছে।

মেলা জমে উঠতেই নৌটঙ্কীর পালা শুরু হয়ে গেল। কাজেই ছিবলির এখন আর ব্যস্ততার শেষ নেই।

অধিকাংশ নৌটঙ্কীর দলের সারা বছরের যা আয় তার অর্ধেক আসে শোণপুরের মেলা থেকে। কাজেই জনতার মনোরঞ্জনে যাতে

ত্রুটি না ঘটে সে জন্য সতর্কতার অন্ত নেই। সতর্কতার অন্য কারণও আছে। একটা আধটা দলই তো এখানে আসে না; সারা আর্যাবর্ত উজাড় হয়ে অসংখ্য দল চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়ে। তীব্র প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পারলে শূন্য হাতেই ফিরতে হবে।

পালা চলার মধ্যে সীতা কাহার একদিন এসে দেখা করে গেল। বলল, 'আমাদের কথা মনে আছে তো?'

ছিবলি বলল, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। আপনারা কবে এসেছেন?'

'দিন কয়েক হল।'

'কোথায় তাঁবু পেতেছেন?'

'পুব দিকে হাতী ঘোড়ার বাজারটার পাশে।'

শোণপুরের মেলা তো একটুখানি ব্যাপার নয়, কয়েক বর্গমাইল জুড়ে তার বিস্তার। না এসে বললে কে কোথায় উঠেছে জানবার উপায় নেই।

ছিবলি বলল, 'আপনাদের পালা শুরু হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' সীতা কাহার মাথা নাড়ল।

'কি রকম ব্যবসা হবে মনে হচ্ছে?'

'ভালই।'

একটু চুপচাপ। তারপর সীতা কাহারই আবার বলল, 'আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আসব ছিবলিজী; আপনি গুসা হবেন না তো?'

ছিবলি বলল, 'কি তাজ্জবের কথা, গুসা হবে কেন! যখন ইচ্ছে হবে আসবেন।'

একটু ভেবে সীতা কাহার হাসতে হাসতে বলল, 'কেন আসব জানেন?'

'কেন?'

'আমি বার বার এলে আপনার চাড় হবে।'

'কিসের চাড়?'

'আমাদের দলে যাবার।'

ছিবলি হাসল, 'আপনি না এলেও আমার চাড় হবে। কথা যখন দিয়েছি, শোণপুরের মেলা শেষ হলেই আপনাদের দলে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

সীতা কাহার বলল, 'তবু আমি আসব।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়।'

'তবে ?'

খানিক ইতস্তত করে সীতা কাহার বলল, 'সত্যি কথাটা বলব ?'

একটু অবাক হল ছিবলি, 'কি, বলুন না—'

'আমার দলের মালিক বলেছে যদ্দিন না আপনাকে নিয়ে আমাদের ওখানে তুলতে পারছি তদ্দিন যেন লেগে থাকি।'

'বুঝেছি।'

সীতা কাহারের এত উৎসাহ এত উদ্দীপনা, কোন কিছুই কাজে লাগল না। তার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল। নবলগঞ্জের দলে যাওয়া হল না ছিবলির।

শোণপুরের মেলার আয়ু যখন শেষ হয়ে আসছে সেই সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল ধনপত।

কার্তিক মাসের দিন। প্রথমে মনে করা গিয়েছিল ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টা হিম লেগে গায়ের উত্তাপ বেড়ে গেছে। তাই ব্যাপারটায় বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি ছিবলি। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর; হুট করে যেমন এসেছে হুট করে তেমনি চলে যাবে।

কিন্তু গেল না। দিন চারেক পর জ্বরটা যখন বাঁকা পথ ধরল তখন ডাক্তার ডাকতে হল। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রুগী দেখে ডাক্তার গম্ভীর মুখে জানালেন, ডবল নিমুনিয়া।

ধনপতকে বাঁচাবার জন্য জলের মত খরচ করে গেল কামেশ্বর;

রাতের পর রাত বাপের শিয়রে বসে কাটিয়ে দিল ছিবলি। কিন্তু না, মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। দিন দশেক বেহুঁশ থাকার পর ধনপত মারা গেল।

নৌটঙ্কী দলে আসার পর ক'টা দিন সুখের মুখ দেখতে পেয়েছিল ধনপত। কিন্তু তার আগের দীর্ঘ পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের জীবনটায় না ছিল থাকার ঠিকানা, না ছিল প্রাণ ধারণের নিরাপত্তা। চলতে চলতে যদি কিছু জুটেছে তো খেয়েছে, নইলে না খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছে। অনাহার, অনিয়ম, অনিশ্চয়তা—তার এত-দিনের জীবনে এই তিনটিই ছিল নিয়ত সঙ্গী। মাথার ওপর দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি-রোদ গেছে। অনাহার চোরাবানের মত তলায় তলায় ক্ষয় ধরিয়ে দিয়াছিল। শরীরে যুঝবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না ধনপতের। রোগের একটি আঘাতেই পৃথিবী থেকে মুছে গেল সে।

বাপের অসুখ বাড়বার পর থেকে আসরে ওঠা বন্ধ করে দিয়েছিল ছিবলি। আর ছিবলির না গাওয়ার অর্থ হল কামেশ্বরের দলের পালা বন্ধ হয়ে যাওয়া। তখন অবশ্য শোণপুরের মেলায় ভাঙা আসর। লোকজন সব চলে যেতে শুরু করেছে, দোকান পসার এক মাসের বিকিকিনি চুকিয়ে চলে যাচ্ছে। সারা শোণপুর জুড়ে ভাঁটার টান ধরেছে। নৌটঙ্কীর আসরে তখন আর তেমন ভিড় লাগত না। অতএব কামেশ্বর খুব যে একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন বলা যায় না। অবশ্য কামেশ্বর যে হৃদয়হীন, তা বলা যায় না। জমজমাট মেলার মাঝখানেও যদি ধনপতের অসুখ বাড়াবাড়ি হয়ে উঠত সে ছিবলিকে জোর করে আসরে তুলত না। মাথা পেতে এই ক্ষতিটুকু সে স্বীকার করে নিত।

যাই হোক বাপের মৃত্যুতে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল ছিবলি। সংসারে ঐ একটি মানুষ ছাড়া নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। কাজেই মাথা কপাল ঠুকে পাগলের মত সে কাঁদতে লাগল।

এই পরম শোকের মুহূর্তে ছিবলির পাশে গিয়ে দাঁড়াল কামেশ্বর। তার মাথায় একটি হাত রেখে গাঢ় গভীর স্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'কেঁদো না ছিবলি, কেঁদো না।'

ছিবলির কান্না থামে না ; সহানুভূতির স্পর্শে তা আরো উত্তাল হয়ে উঠল। বিকৃত জড়িত সুরে সে গোঙাতে লাগল, 'বাপু ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই আমার।'

'বাপ চিরদিন কারো থাকে না ছিবলি। নিজেকে শান্ত কর ; এমন করে ভেঙে পড়লে চলে কখনও।'

ছিবলির কান্না এবং শোকের তীব্রতা কিছু স্তিমিত হয়ে এলে ধনপতের দেহ খাটুলি করে নিয়ে যাওয়া হল গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে। ছিবলিই মুখাগ্নি করল। চিতার আগুনে দেখতে দেখতে ধনপত নিঃশেষ হয়ে গেল।

চিতার আগুন যখন জ্বলছে সেই সময় দেখা গেল দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফুলনরাম। তার চোখে চিরদিনের সেই বিস্ময়টা নেই। সে দুটি করুণ, বিষণ্ণ, সহানুভূতি আর সমবেদনায় টলোমলো।

॥ আট ॥

বাপের মৃত্যু কিছুদিনের জন্য জীবনকে যেন থমকে দিয়েছিল। কবে মা মরেছিল, কোন শৈশবে চেতনার কোন অস্ফুট উষায়—আজ আর মনেও করতে পারে না ছিবলি। জীবনে এই প্রথম মৃত্যু দেখল সে! বাপ ছাড়া চরাচরে যখন আর কেউ ছিল না তখন এই মৃত্যুটা ছিবলির প্রাণে নিদারুণ লেগেছে। বাপের মৃত্যু তাকে যেন একেবারে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। একটা বিচিত্র বিষাদময় আচ্ছন্নতা সব সময় তাকে ঘিরে থাকে।

তাঁবু থেকে সারাদিনে একবারও বেরোয় না ছিবলি। ঘুমোয় না,

স্নান করে না। বাপ বেঁচে থাকতে নিজের হাতে রান্না করত। ইদানীং রান্নাবান্নার পাট তুলে দিয়েছে। দলের বারোয়ারি রান্নাঘর থেকে যে খাবার আসে বেশির ভাগ সময় তা এক কোণে পড়ে থাকে। পিঁপড়েরা দল বেঁধে এসে তাতে ভাগ বসায়; ইঁদুর কিংবা মাছিরা এসে ইচ্ছামত ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। ছিবলি বসে বসে ছাখে কিন্তু হাত তুলে যে তাদের তাড়িয়ে দেবে তেমন উৎসাহটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।

ছিবলির এই পরম শোকের দিনে সত্যিকার বন্ধুর কাজ করছে কামেশ্বর। যখন তখন সে আসে। পাশে বসে সান্ত্বনা দেয়। সস্নেহে বলে, 'এত ভেঙে পড়লে কখনও চলে। নিজেকে তো বাঁচতে হবে। না খেয়ে না ঘুমিয়ে চেহারাখানা কি করে ফেলেছ, দেখ তো।'

শুধু সান্ত্বনাই ছায় না কামেশ্বর। জোর করে তাকে স্নান করায়, খাওয়ায়। বিকেলের দিকে এসে তাড়া দিয়ে বলে, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।'

উদাস সুরে ছিবলি বলে, 'না।'

'কী না?'

'আমার কোথাও যেতে ভাল লাগছে না।'

'লকীন সারা দিন তাঁবুতে বসে বসে ভাবলে মন তো আরো খারাপ হবে। একটু বেড়াও, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো। দুঃখটা বুকের ভেতর পুষে না রেখে ভুলে যেতে চেষ্টা কর।' জোর করেই ছিবলিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় কামেশ্বর।

যত দিন যাচ্ছে কামেশ্বর সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে ছিবলির মনে। লোকটা কঠিন ধাতুতে-গড়া চতুর বুদ্ধিমান হিসেবী ব্যবসাদারই না, তার বুকের অন্তঃপুরে একটা কোমল দিকও রয়েছে। তার স্পর্শ পেয়ে অভিভূত হয়ে গেছে ছিবলি।

এর ভেতর সীতা কাহার যে কতবার এসেছে তার হিসেব নেই। ধনপতের মৃত্যুতে প্রচুর আক্ষেপ করেছে সে, প্রচুরতর সান্ত্বনা

দিয়েছে। এবং একথা-সেকথার ফাঁকে খুব কৌশলে আসল বক্তব্যটি প্রতিবারই জানিয়ে গেছে। অর্থাৎ কবে ছিবলি নবলগঞ্জের দলে গিয়ে নাম লেখাবে সেটাই তার জানার উদ্দেশ্য। ছিবলির প্রতিশ্রুতির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে গেছে সীতা কাহার। শোণপুরের মেলা ভাঙলেই ছিবলি তাদের দলে যাবে বলেছিল। সেই আশায় উন্মুখ হয়ে তারা বসে আছে।

সীমাহীন আচ্ছন্নতার ভেতর ছিবলি প্রতিবারই জানিয়েছে, প্রতিশ্রুতির কথা সে ভোলে নি। তবে আপাততঃ যা তার মানসিক অবস্থা তাতে কবে নবলগঞ্জের দলে যেতে পারবে, বলা সম্ভব নয়।

সীতা কাহার কিন্তু আসা ছাড়ে না। বলে, 'সে পরে দেখা যাবে'খন। আপনার মনটা তো আগে সুস্থ হোক।'

দেখতে দেখতে শোণপুরের মেলার আয়ু শেষ হল। এখানকার আসর ভেঙে এবার অন্য দিগন্তে পাড়ি দেবার পালা। তাঁবু টাবু গুটিয়ে যখন বয়েল গাড়িতে তোলা হল, নৌটঙ্কী দলের সবাই যখন গাড়ির ছইয়ের তলায় গিয়ে বসল সেইসময় সীতা কাহার ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বলল, 'আমাদের দলে যাবার কী করলেন?'

হাজার হোক কামেশ্বরের দল ছিবলির পরিচিত। এখানে অনেক দিন সে কাটিয়ে দিয়েছে। বাপ বেঁচে থাকলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু একা একা নতুন দলে অসীম অনিশ্চিয়তার ভেতর ঝাঁপ দিতে তার সাহস হল না।'

ছিবলি বলল, 'এখন যেতে পারলাম না।'

হতাশ ভাঙা গলায় সীতা কাহার বলল, 'লকীন আপনি তো আমাদের কথা দিয়েছিলেন।'

'তা দিয়েছিলাম।'

'তবে?'

'আপনাদের দলে যাব, এ তো ঠিকই ছিল। লকীন বাপু মরে

গিয়ে—' ছিবলির চোখ সজল হয়ে উঠল।

সীতা কাহার বলল, 'আমরা কিন্তু বড় আশা করে ছিলাম।'

ছিবলি চুপ করে রইল।

সীতা কাহার আবার বলল, 'আপনি যদি কোনদিন এ দল ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চান, আমাদের কথা মনে রাখবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি অবশ্য খোঁজ রাখব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে সময় পেলে দেখা করবেন।'

'নিজেদের গরজেই করব।'

একসময় বয়েল গাড়ির মিছিল চলতে শুরু করল।

॥ নয় ॥

শোণপুর থেকে সোজা উত্তর প্রদেশ।

বেনারসের কাছে একটা মেলায় চলে এল ছিবলিরা। জায়গাটার নাম রৈবত। রৈবতের মেলার মেয়াদ এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন।

ধনপতের অসুখ ঘোরালো হবার পর থেকে গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ছিবলি। রৈবতে এসে আবার সে আসরে উঠল। সময় তার শোকের উচ্ছ্বাস এবং তীব্রতা অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। অন্তহীন সেই বিষাদটাও অনেকখানি কেটে গেছে।

রৈবতের আসার পর দিন সাতেক পার হল। তারপর একদিন রাত্রে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল।

সেদিন নৌটঙ্কীর পালা ভাঙল মাঝরাতে। অন্য দিন পালা ভাঙার পর যে যার তাঁবুতে চলে যায়। সেদিন কামেশ্বর কিন্তু ছিবলির সঙ্গ ছাড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে তার তাঁবু পর্যন্ত চলে এল।

কি বুঝে ছিবলি বলল, 'আপনি কি কিছু বলতে চান?'

'হ্যাঁ।' কামেশ্বর মাথা নাড়ল।

'বলুন—'

'এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।'

'ভেতরে আসুন।'

দুজনে তাঁবুর ভেতর চলে এল। একটা হারিকেন এককোণে নিবু-নিবু হয়ে ছিল; চাবি ঘুরিয়ে সেটার তেজ বাড়িয়ে দিল ছিবলি। তারপর বেতের মোড়া দেখিয়ে বলল, 'বসুন—'

কামেশ্বব বসলে ছিবলি বলল, 'এবার বলুন—'

কামেশ্বর ইতস্তত করতে লাগল।

ছিবলি তাড়া লাগাল, 'কি হল, বলুন—'

'বলব!'

'কি আশ্চর্য, বলার জন্যেই তো এসেছেন।'

'লকীন—'

'কী?'

'আজ থাক।'

'থাকবে কেন?'

'না-না, আজ না। আরেক দিন এসে বলব।' ছিবলির কিছু বলবার বা বাধা দেবার আগেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল কামেশ্বর।

পরের দিন ভোর হতে না হতে আবার সে এসে হাজির। চোখের কোলে গাঢ় কালির রেখা, চুল উস্কখুস্ক, দৃষ্টি আরক্ত। দেখেই মনে হয়, সারা রাত ঘুমোয় নি।

অবাক, কিছুটা বা বিভ্রান্তের মত কামেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রইল ছিবলি।

কামেশ্বর বলল, 'আজ আবার না এসে পারলাম না। তুমি আবার গুসা হলে না তো?'

ছিবলি লক্ষ্য করল বিচিত্র এক অস্থিরতা কামেশ্বরের চোখে-মুখে

সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তার দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যস্তভাবে বলল, 'আরে না-না, গুসা হব কেন। আপনি বসুন—'

কামেশ্বর বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কালকে কথাটা বলতে পারি নি। সাহস হচ্ছিল না।'

ছিবলি মৃদু হাসল, 'আজ সাহস হয়েছে?'

'হয়েছে কিনা জানি না। তবে কথাটা না বলে আমার আর উপায় নেই। কাল সমস্ত রাত ছটফট করে কাটিয়েছি। একটুও ঘুমোতে পারি নি।'

'সে আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। লকীন—'

'বল—'

'কথাটা কী?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না কামেশ্বর। খুব সম্ভব চুপ করে থেকে বক্তব্যটা মনে মনে সাজিয়ে নিল। তার পর খুব আস্তে আস্তে শুরু করল, 'তোমার বাপ মারা গেছে; দুনিয়ায় আপন বলতে তোমার কেউ নেই। লকীন আওরতের এভাবে জীওন চলতে পারে না। বিশেষ করে তোমার মত জওয়ানী আওরতের। কথাটা মানো কিনা?'

কামেশ্বর কী বলতে চায় বুঝতে পারল না। তবু মাথা নেড়ে জানাল, ঐ কথাটা না মেনে উপায় কী।

কামেশ্বর বলতে লাগল, 'জওয়ানী আওরতের মাথার ওপর একজন পুরুষ থাকা দরকার। তুমি যদি ভরসা দাও তো একটা কথা বলি।'

সন্দিগ্ধ কাঁপা গলায় ছিবলি বলল, 'কী কথা?'

'আমি তোমার চিরজীওনের দায়িত্ব নিতে চাই।'

'মতলব (অর্থ)?'

'তোমাকে আমি সাদী করতে চাই।'

সমস্ত সত্তার মধ্যে ঝন ঝন করে হঠাৎ কি যেন ভাঙচুর শুরু হল। বুকের গভীরে অদৃশ্য কতকগুলো দেওয়ালে অনেকক্ষণ ধরে তার প্রতিধ্বনি বেজে গেলে। অস্ফুট গলায় ছিবলি বলল, 'সাদী!'

অসীম আগ্রহে কামেশ্বর বলল, 'হাঁ—হাঁ—'

'আমাকে !'

'হাঁ হাঁ। তোমাকেই সাদী করতে চাই। তোমার কী মত বল।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না ছিবলি। তার মনে পড়ল বাপের মৃত্যুর পর থেকেই এই লোকটা ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতা করে চলেছে। তার অন্তরঙ্গতার নেপথ্যে কি তবে সুদূরপ্রসারী এই ইচ্ছাটাই ছিল? সেই জন্যেই কি ছক কেটে মাপজোখ করে পরম শোকের মুহূর্তে গুটি গুটি করে তার দিকে এগিয়েছিল সে?

কামেশ্বর এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে, 'চুপ করে রইলে কেন? বল—'

ছিবলি চমকে উঠল, খানিকক্ষণ ভেবে বলল, 'ক'টা দিন আমাকে ভাবতে দিন।'

বেশ, ভেবেই জবাব দিও। ক'দিন অপেক্ষা করব বল।'

'এক হপ্তা।'

'এক হপ্তা কিন্তু।'

'হাঁ—হাঁ, এক হপ্তাই।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাত দিন ধরে কথাটা ভাবল ছিবলি। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে, এক মুহূর্তের জন্য ভাবনাটা তার সঙ্গ ছাড়ল না।

কামেশ্বর যা বলেছে তা-ই বোধ হয় ঠিক। স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সবসময় একজন পুরুষ অভিভাবক দরকার। বুড়ো হোক, দুর্বল হোক, অন্ধ হোক—এতদিন তার একটা বাপ ছিল। ছিবলির মনে হত, পাহাড়ের আড়ালে আছে। বাপের মৃত্যুর পর এখন মনে হয়, জগতে তার মত নিরাশ্রয় আর কেউ নেই।

ছিবলি জানে তার মূল্য অনেক। নৌটঙ্কীর দলগুলো চড়া দামে তাকে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সে যদি একটু হাতছানি দ্যায় নবলগঞ্জের দল থেকে সীতা কাহার এখুনি ছুটে আসবে। বাপ বেঁচে

থাকলে কিংবা সে যদি পুরুষ মানুষ হত কবেই চলে যেত। কিন্তু এখন আর যেতে সাহস হয় না। যত দামই তার থাক, যেহেতু সে মেয়েমানুষ, একা নিঃসঙ্গ যুবতী—একটা অচেনা ভয় সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে আছে। দ্বিধা-সংশয়-সন্দেহে ছিবলির প্রতিটি মুহূর্ত জর্জরিত।

নবলগঞ্জের দলটার পরিবেশ সম্পূর্ণ অজানা। যত লোভই তারা দেখাক, যত টাকাই দিতে যাক—সর্বাঙ্গে রূপের ঢল নিয়ে সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়তে হবে কিনা, কে জানে। একা নবলগঞ্জের দলই বা হবে কেন, যে দলেই সে যাক, যেহেতু সে রূপসী যুবতী—বিপদের সম্ভাবনা আছেই।

সেদিক থেকে কামেশ্বরের দলটাকে সে অনেক ভাল জানে। প্রথম প্রথম কেউ কেউ ইতরামি করতে চাইলেও পরে থেমে গেছে। তা ছাড়া কামেশ্বর স্বয়ং কোনদিন তার সঙ্গে আপত্তিকর ব্যবহার করে নি। বরং যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েই সে তাকে দলে রেখেছে। ছিবলির জন্য শিউপূজনের মত গুণী লোক দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল ; তাতে বেশ ক্ষতিও হয়েছে দলের। তবু কোনদিন কোন কথা তাকে বলে নি কামেশ্বর ; বিন্দুমাত্র অনুযোগ ছায় নি।

এ দলে ছিবলি এসেছে বছর দেড়েকের মত। কামেশ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে আপত্তি করবার মত কিছুই এ পর্যন্ত তার কানে আসে নি, নিজের চোখেও খারাপ কিছু কখনও পড়ে নি। তবে ছিবলি জানে, লোকটা প্রচুর মদ খায়। নেশায় প্রায় সব সময়ই চুর চুর হয়ে থাকে।

নেশাটুকু বাদ দিলে লোকটাকে মোটামুটি খারাপ মনে হয় না। তা ছাড়া খুব বড় না হলেও বেশ ভাল একটা দলেরই মালিক কামেশ্বর। ভবিষ্যতে তার ওপর নির্ভর করা চলে। অনেক ভাবনায় কামেশ্বরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল ছিবলি। আর রাজী হবার সাত দিনের ভেতরই বেশ ঘটা করে বিয়ের পালা চুকিয়ে ফেলল কামেশ্বর।

বিয়ে যেদিন হল সেদিন স্বামীর সঙ্গে বাসরে যাবার সময় দলের একটা ছোকরা গাইয়ে ছুটতে ছুটতে এসে একখানা নতুন শাড়ি ছিবলির হাতে দিল।

একটু অবাক হয়ে ছিবলি বলল, 'কিসের শাড়ি রে তোতা?'

তোতা বলল, 'ফুলনরাম বলে এক আদমী এটা আপনাকে দিতে বলেছে ছিবলিয়াজী।'

এ বিয়েতে দলের ক'জন ছাড়া আর বিশেষ কারোকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি; ফুলনরামকে তো নয়ই।

শাড়িটা হাতে নিয়ে অভিভূতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ছিবলি।

॥ দশ ॥

বিয়ের পর স্বাভাবিক নিয়মেই কামেশ্বরের তাঁবুতে গিয়ে উঠল ছিবলি। যখন এক মেলা থেকে আরেক মেলায় যায় তখন কামেশ্বরের গাড়িতেই ওঠে।

নতুন বিবাহিত জীবনটা নেশার মত ছিবলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ক্লান্তি, অবসাদ, আরাম, বিশ্রাম—কোন কিছুই গ্রাহ্য করে না সে। নৌটঙ্কী দলে রাতের পর রাত জাগতে হয়; তার পর আছে কামেশ্বরের উদ্দাম সোহাগ।

নতুন জীবনের আচ্ছন্নতা না কাটলেও ছিবলি টের পাচ্ছে রাতের পর রাত জাগার ফলে শরীর তার অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করল, চোখের কোলে গাঢ় কালির পোঁচ পড়েছে; রূপের দীপ্তি কিছুটা মলিন করে দিয়ে মাকড়সার জালের মত সরু সরু সূক্ষ্ম রেখায় ক্লান্তির ছায়া নেমেছে।

কামেশ্বর শর্মাও বোধ হয় তা লক্ষ্য করেছিল। সে বলল, 'তুমি দুর্বল হয়ে পড়ছ ছিবলি। নৌটঙ্কীর দলে আসর জাগা খুব খাটনির কাজ। তার ওপর নয়া সাদী; বুঝলেই তো—' চোখের কোণদুটো কুঁচকে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল সে।

ঘুঁষি পাকিয়ে ছিবলি বলল, 'আহা-হা-হা—'

কামেশ্বর বলল, 'সত্যি কথা বললাম কিনা—'

'সত্যি মিথ্যে কিছু তোমায় বলতে হবে না।'

খানিক চুপ করে থেকে কামেশ্বর বলল, 'তোমায় একটা কথা বলি।'

ছিবলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আর কোন কথা বলতে হবে না।' তার আশঙ্কা বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কোন আদি রসাত্মক ঝাঁঝালো মন্তব্য করে বসবে কামেশ্বর।

কামেশ্বর কিন্তু সে দিক দিয়েই গেল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার যা চালচলন তাতে খুব বেশিদিন এ লাইনে টিকতে পারবে না। বরং আমি যা বলি তাই কর।

ছিবলি শুধলো, 'কী করতে বলছ?'

'মদ ধর।'

'মদ!'

'হাঁ। ওটা ধরলে জোর পাবে। তোমার শরীরের যা হাল হচ্ছে ওটা না ধরলে পারবে না। মদ খেলে দেখবে নেশার ঘোরে দশগুণ খাটতে পারছ। ছাখো না, নৌটঙ্কী দলে সবাই ও জিনিসটা খায়।'

ছিবলির জীবনে তমোগুণের চাইতে সাত্ত্বিকতার অংশই বেশি। জীবনে কোনদিন মদ ছুঁয়ে ছাখে নি সে। ভয়ে ভয়ে বলল, 'লকীন—'

'কী?'

'এতদিন তো মদ না ছুঁয়েই গান গেয়েছি—'

'এতদিনের কথা ছেড়ে দাও। মনে রেখো বয়েসটা দিন দিন

সামনের দিকে এগুচ্ছে ; পিছুচ্ছে না। খুনের (রক্তের) তাগদও কমে আসছে।'

ছিবলি আবারও বলল, 'লকীন—'

প্রবলবেগে দু হাত নেড়ে কামেশ্বর শর্মা বলল, 'লকান টকীন কুছ নহী। আমি তোমাকে চুর চুর হতে বলছি না। রাত জাগার জন্যে আর বেশি খাটুনির জন্যে যেটুকু দরকার মাত্র সেটুকুই খেতে বলছি।'

কামেশ্বর বলা মাত্রই অবশ্য নেশা ধরল না ছিবলি ; অনেক দ্বিধা এবং সংশয়ের পর সব দিক বিবেচনা করে ওষুধ গেলার মত সিকি গেলাস করে মদ খাওয়া শুরু করল। বুকটা জ্বলে যায়, শিরায় শিরায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে তবু কামেশ্বরের কথাই যে ঠিক, হাতে-নাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ঝাঁঝালো উগ্রস্বাদ দিশী মদ স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করে তাতে অবসাদের কথা আর মনে থাকে না।

আশ্চর্যের কথা, নেশা করে ছিবলি যেদিন প্রথমে আসরে উঠল অন্য দিনের মত সেদিনও আসরে ফুলনরামের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটা আছে,—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—কাছাকাছি আছে। ছায়ার মত নীরব সঙ্গী হয়ে সে তাকে ঘিরে আছে।

যাই হোক, ফুলনরামের চোখে কিন্তু সেদিন চিরকালের সেই বিস্ময় বা মুগ্ধতা বোধ দেখা গেল না। সে চোখ কেমন যেন করুণ বিষণ্ণ, ব্যথিত। ছিবলি যে নেশা করতে শুরু করেছে তা কি টের পেয়ে গেছে ফুলনরাম।

মদ ধরলেও মদের প্রতি ছিবলির যা মনোভাব তাকে বিদ্বেষই বলা যায়। অসীম বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও কবে থেকে যে সে নেশার মাত্রা বাড়াতে শুরু করেছিল, খেয়াল নেই। বাড়াতে বাড়াতে মাস কয়েক

পর দেখা গেল নেশাটা তাকে গ্রাস করে বসেছে। ইদানীং দিবারাত্রি সে চুর চুর হয়ে থাকে।

আর এই নেশার ভেতরেই একটা ব্যাপার টের পেয়ে যাচ্ছে ছিবলি। কামেশ্বর তাকে বিয়ে করেছে ঠিকই, একই সঙ্গে বসবাস করছে, যতটুকু প্রাপ্য তার চাইতে অনেক বেশিই আদর করে, আসর ভাঙার পর একসঙ্গে মদের বোতল আর উগ্র মশলদার খাবার নিয়ে বসে। তবু ছিবলির মনে হয়, কামেশ্বরের তীব্র উত্তেজক সোহাগের ভেতর কোথায় যেন অনেকখানি ফাঁক আছে।

বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আগে আর ছিল না ছিবলির। তবু গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে গান গাইবার সময় মধুর দম্পত্য-লীলার টুকরো টুকরো যে সব ছবি সে দেখেছে, যে সব কাহিনী শুনেছে—সেগুলোর সঙ্গে কামেশ্বরের সোহাগ যেন মেলে না। ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না কিন্তু ছিবিলর অস্তিত্বের নিভৃত তলদেশ থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে জানায়, স্ত্রীর মত নয়—রক্ষিতা বা বাঁধা মেয়েমানুষের সঙ্গে লোকে যে রকম ব্যবহার করে তার প্রতি কামেশ্বরের ব্যবহার অনেকটা সেইরকম। আদর-সোহাগ সবই করে কামেশ্বর—কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের উত্তাপ যেন কম। এ নিয়ে ছিবলির বুকের ভেতর কোথায় যেন খানিকটা অস্বস্তির ছায়া পড়েছে। হাজার হোক কামেশ্বর তার স্বামী। এই যে লোকটির মধ্যে যে স্নিগ্ধ আকুলতা ছিবলি প্রত্যাশা করে তার বিন্দুমাত্রও মেলে না।

নেশাটা যতক্ষণ চড়া তারে বাঁধা থাকে ততক্ষণ কোন ব্যাপারে হুঁশ থাকে না। কিন্তু ঘোরটা ছুটে গেলেই একটা দুশ্চিন্তা যেন ছিবলিকে বেষ্টন করতে থাকে। কেন কামেশ্বর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে এমন বিশ্রী খাতে বইয়ে দিচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না ছিবলি। কেমন করেই বা করবে ? কামেশ্বর তাকে গালাগালি ছায় না, মারধোর করে না। কোন রকম দুর্ব্যবহার পেলে তো প্রতিবাদ করবে, আপত্তি

জানাবে। অতএব মনের কোণে সঙ্গোপন যন্ত্রণা বয়েই দিন কেটে যায় ছিবলির।

এ যন্ত্রণা কারোকে বলবার নয়, এর ভাগ কারোকে দেবার নয়। নিজের আগুনে নিয়ত ধিকি ধিকি জ্বলে মরা ছাড়া ছিবলির উপায় নেই।

যে গহনা-সঞ্চারী দুঃখের কথা কারোকে বলা যায় না সেটা ভুলবার জন্য নেশার হাতে নিজেকে আরো বেশি করে সঁপে দিতে লাগল ছিবলি।

এদিকে তার নেশাটা যত বাড়ছে দর্শকদের ভেতর ফুলনরামের চোখ ততই বিমর্ষ ততই ছায়াছন্ন আর করুণ হয়ে যেতে লাগল।

॥ এগারো ॥

বিয়ের পর থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ করে আসছে ছিবলি। তাকে আর মাইনে দ্যায় না কামেশ্বর। আইনত এবং ধর্মত যখন স্ত্রী তখন মাইনে-করা লোকের মত মাসের শেষে টাকা দেওয়া হয়ত অসম্মানজনক বলে মনে করে সে।

যাই হোক দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল।

মেলায় মেলায়, গঞ্জে গঞ্জে আর দেহাতী শহরে-বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন ফুলনরামের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ছিবলি। ফুলনরামের মাথার অনেকখানি অংশ সাদা হয়ে গেছে। মুখের চামড়া অসংখ্য রেখায় কুঞ্চিত। শরীরের বাঁধুনিও তার শিথিল হয়ে গেছে। অর্থাৎ সর্বাঙ্গে বয়েস তার সীলমোহর মারতে শুরু করেছে।

সেইদিনই পালাশেষে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ছিবলি। ফুলনরামেরই শুধু নয়, দেখা গেল, তারও চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর

তার লুকনো রয়েছে। কপালে-গালে-গলায়, সারা দেহের কোথাও আগের সেই মসৃণতা নেই। সব কুঁচকে গিয়ে শ্লথ হয়ে কেমন যেন কর্কশ হতে আরম্ভ করেছে। চারদিকে বয়সের ছাপ আবিষ্কার করার পর নিজের সম্বন্ধে আরো যেন সচেতন হয়ে উঠল ছিবলি। লক্ষ্য করল, গলাটা কবে যেন ভারী হয়ে গেছে। আগের মত অনায়াস সুরের ঢেউ সেখানে আর খেলছে না। আগের সেই কাঁচা, সরস, তীক্ষ্ণ ভাবটি আর নেই। বেসুরো না হলেও মন্থর, ভারী এবং শিথিল হয়ে এসেছে।

শরীরে এবং গলায় বয়সের যে ভার পড়েছে, সে খবরটা একলা ছিবলিই পায় নি; শ্রোতা এবং দর্শকরাও পেয়ে গেছে। কামেশ্বরের চোখকেও তা এড়িয়ে যেতে পারে নি।

ইদানীং আসরে উঠলে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। ছিবলির গান শুনে তারা পুরোপুরি তৃপ্ত নয়। আজকাল তাদের দলটাকে ঘিরে আগের মত সেই মত্ততা নেই; ভিড়ও তেমন হয় না। সবকিছুর মধ্যে একটা ভাটার টান চলছে যেন।

একদিন কামেশ্বর বলল, 'অনেককাল ধরে একনাগাড়ে গাইছ; এখন তোমার বিশ্রাম দরকার। ভাবছি দলে একটা নতুন মেয়ে আনব।'

ইঙ্গিতটা বুঝল ছিবলি। তাকে দিয়ে নৌটঙ্কীর দল আর চলছে না; অতএব নেপথ্যে সরে যেতে হবে।

হৃৎপিণ্ডে কোথায় যেন তীব্র মোচড় পড়ল; যুগপৎ যন্ত্রণা এবং অবসাদ বোধ করল ছিবলি। কিন্তু কামেশ্বর যে ইঙ্গিত দিয়েছে তা তো মিথ্যে নয়। মানুষের যৌবন, কণ্ঠস্বরের সজীবতা চিরদিন থাকে না। অতএব অমোঘ নিয়মেই ঝলমলে আসরের মাঝখান থেকে বিস্মৃতির অন্ধকারে নির্বাসিত হতে হবে।

ক্লান্ত নিষ্প্রাণ সুরে ছিবলি বলল, 'বেশ তো, নতুন মেয়েই আন।'

দিনকয়েকের মধ্যেই একটি সুকণ্ঠী যুবতীকে যোগাড় করে ফেলল কামেশ্বর।

নতুন মেয়েটির নাম পিয়ারী। পিয়ারী সুগায়িকা তো বটেই, রূপসীও। তার দিকে তাকালে ছিবলির প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। পিয়ারীর রূপে বিচিত্র এক মাদকতা আছে। তার দিকে তাকালে স্নায়ু ঝিমঝিম করতে থাকে। দেখা গেল কামেশ্বর তার সমস্ত মনোযোগ পিয়ারীর দিকে ঢেলে দিয়েছে। তার সমস্ত অস্তিত্ব ইদানীং পিয়ারীর মধ্যে আচ্ছন্ন।

প্রথম প্রথম নিজেকে সংযত রাখতেই চেয়েছিল ছিবলি। অবশেষে অসহিষ্ণু হয়ে একদিন বলেই ফেলল, 'নতুন ছুঁড়িটার সঙ্গে অত মাখামাখি করছ কেন?'

'মাখামাখি।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কামেশ্বর।

'নিশ্চয়ই।'

'কি আশ্চর্য! মেয়েটা নতুন দলে এল। শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার জন্যে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে না?'

'হবে বৈকি। তবে যেটুকু মেলামেশা দরকার তুমি তার চাইতে ঢের বেশি করছ। দেখতে খারাপ লাগছে।'

'তোমার মন ভারি নোংরা, তাই খারাপ দেখছ।'

জীবনের আলোকিত মঞ্চ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য গোপন যন্ত্রণা ছিলই। সেটাই এবার বিচিত্র পথে বেরিয়ে এল। ছিবলি প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আমার মন নোংরা? দলের লোক-গুলোকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমার চালচলন আজকাল কেমন হয়ে উঠছে।'

সেই শুরু। তারপর থেকে ক্রমশ কামেশ্বর পিয়ারীর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল। এই অন্তরঙ্গতা যত বাড়ছে ঠিক সেই মাপেই কামেশ্বরের কাছ থেকে ছিবলি দূরে সরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা এমন এক তিক্ততার মধ্যে পৌঁছুল যে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না; পরস্পরের সঙ্গ তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। এমন কি এক তাঁবুর ভেতরে থেকেও তাদের বিছানা হল আলাদা। যেন

পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তের দুটি অপরিচিত মানুষ অলৌকিক কোন যোগাযোগে কাছাকাছি এসে পড়েছে।

যে কামেশ্বর এতকাল সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান-সোহাগ আদর তার পায়ে সঁপে দিয়ে বসেছিল, পিয়ারী আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকের এমন অভাবিত আকস্মিক পরিবর্তন কেমন করে হচ্ছে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না ছিবলি। তা ছাড়া রক্ষিতার মত ব্যবহার করলেও সে ন্যায়ত, ধর্মত কামেশ্বরের স্ত্রী। অথচ তারই চোখের সামনে লোকটা পিয়ারীকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করে চলেছে।

কিংবা এ সব হয়ত বেলেল্লাপনা বা বাড়াবাড়ি নয়। ছিবলির অসুস্থ মনের ফেনায়িত কল্পনামাত্র।

অবশেষে বিদ্বেষটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। ছিবলি নিজেই একদিন কামেশ্বরের তাঁবু থেকে নিঃশব্দে অন্য আরেক তাঁবুতে চলে গেল। এক দলেই আছে; মাত্র এটুকু সম্পর্কই তার রইল কামেশ্বরের সঙ্গে।

একটা ব্যাপার ছিবলি লক্ষ্য করেছে, যতদিন সে আসরে উঠে গাইতে পারত ততদিন এ দলে তার খাতির ছিল রাজেন্দ্রাণীর মত। কিন্তু ইদানীং কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আগে তার তাঁবুতে খাবার দিয়ে যাওয়া হত। আজকাল তা বন্ধ হয়েছে। সবার সঙ্গে বারোয়ারি রান্নাঘরে গিয়ে তাকে খেয়ে আসতে হয়। যেখানে একটুকরো মাংস কি ডিমের জন্য প্রতিদিন ছোঁ-মারামারি; চিৎকার, কুৎসিত ঝগড়া। অসহ্য-অসহ্য। বেশির ভাগ দিনই খেতে যাবার ইচ্ছা হয় না ছিবলির। চুপচাপ না খেয়ে তাঁবুর কোণে পড়ে থাকে সে।

যাই হোক, ছিবলি যে অন্য তাঁবুতে চলে গেল, সে ব্যাপারে একটা কথাও জিজ্ঞেস করে নি কামেশ্বর। কামেশ্বরের প্রাণে তার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহও বুঝি অবশিষ্ট নেই। আহত অপমানিত জর্জরিত ছিবলি এক কোণে সবার দৃষ্টির আড়ালে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

অপমান আর উপেক্ষার শেষ প্রান্তে পৌঁছে নিজের মধ্যে যেখানে যতটুকু আগুন এবং শক্তি অবশিষ্ট ছিল সব একত্র করে একদিন ছিবলি কামেশ্বরের কাছে ছুটে গেল। নীরস কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মতলব কী?'

ছিবলির উগ্র ভয়ানক চেহারা দেখে চমকে উঠল কামেশ্বর, 'কিসের?'

'তুমি নাকি পিয়ারীকে সাদী করবে?'

'কে বললে?'

কেউ এ কথা বলে নি। ছিবলির, ক্ষুব্ধ, অপমানিত, ঈর্ষাজর্জর মন নিজের থেকেই কল্পনা করে নিয়েছে। সে বলল, 'সবাই বলছে।'

চোখ কুঁচকে কামেশ্বর বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তাই যাচাই করতে এসেছ?'

'এমন সুখবর, যাচাই করে যাওয়াই তো উচিত।'

'সবাই যখন বলছে তখন ধর সত্যি।'

কামেশ্বরের বলার ভঙ্গিটা লক্ষ করার মত মনের অবস্থা নয় ছিবলির। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে আমার—আমার কী হবে? আমি তোমার বিয়ে করা আওরত।'

'কি আবার হবে। যেমন আছ তেমনই থাকবে।'

'না।'

'কী না?'

'পিয়ারীকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না।'

ঝগড়ার স্বরূপটাই এই কোথাও সে থামতে জানে না; ঝোঁকের বশে দুর্বার বেগে এগিয়ে যায়। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কামেশ্বর, 'তবে কি তোকে নিয়েই বাকি জীওনটা কাটাতে হবে?'

চমকে উঠল ছিবলি। তার পরেই চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, জরুর তাই কাটাতে হবে। আর দুনিয়ার সেটাই নিয়ম।'

'আমাকে নিয়ম দেখাতে এসেছিস মাগী! তোর এখন আছে কি যে তোকে নিয়ে ঘর করতে হবে!'

কিন্তু একদিন তো ছিল।'

'তখন মাথায় করে রেখেছি।'

ছিবলি চকিত হয়ে উঠল। তবে কি রূপ-যৌবন-কণ্ঠস্বর যতদিন ছিল, ততদিনই তার কদর ছিল? সেগুলো যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে? তাই বুঝি ঠিক। এখন আর কামেশ্বরের লালসার ইন্ধন সে হতে পারবে না; মাতাল-করা কণ্ঠস্বরে তার ব্যবসাকে লাভবান করে তোলাও ছিবলির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব জীবনের সকল দিক থেকে দু হাতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে কামেশ্বর।

তবে কি তার সঙ্গে কামেশ্বরের বিয়েটা ছলনা মাত্র? গভীর স্বার্থের জন্যই ঐ চাতুরীটুকু খেলেছিল লোকটা? হয়ত—হয়ত। হয়ত নয়, নিশ্চয়ই। এখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে; কামেশ্বর আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিয়ে করে সবরকম ভাবে তাকে প্রতারণা করেছে লোকটা। এমন কি নবলগঞ্জের দল পর্যন্ত যেতে দ্যায় নি।

জ্বালাভরা কঠিন সুরে ছিবলি বলল, 'তুমি কি করতে চাও এখন? আমাকে তাড়িয়ে দেবে?'

'তাড়াবার কথা আসছে কিসে?'

'আসছে কি না ভেবে দেখ।'

'অত ভাবাভাবির সময় আমার নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ছিবলি। তারপর বলল, 'বেশ, আমার দরকার যখন ফুরিয়েছে তখন চলেই যাব। তবে তার আগে আমার হিসেব মিটিয়ে দাও।'

খানিক অবাক হয়ে কামেশ্বর বলল, 'কিসের হিসেব?'

তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে একটা পয়সাও তো আর

দাও নি। তা ছাড়া বিয়ের আগে কিছু টাকা আমার জমেছিল; সেই টাকা তোমার কাছে জমা রেখেছিলাম। সব দাও; তোমায় মুক্তি দিয়ে আমি চলে যাব।

'টাকা-পয়সা আমি দিতে পারব না।'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত চেঁচিয়ে উঠল ছিবলি, 'টাকা না নিয়ে আমি যাব না।'

কামেশ্বর উত্তর দিল না; দেবার প্রয়োজনই বোধ করল না।

তারপরও দলে থেকে গেল ছিবলি। কারণ অবশ্য টাকাটা আদায় করা; তবে প্রাণের কোণে আরেকটা গোপন দিকও ছিল। কামেশ্বরের সঙ্গে পিয়ারীর সম্পর্কটা কতদূর পেঁছিয় সেটা দেখা। সে থাকতে খুব বেশিদূর অবশ্য পৌঁছুতে পারবে না; পৌঁছুতে দেবে না সে। তার উপস্থিতিটাই নিদারুণ প্রতিবাদ অথবা সাজ্যাতিক যুদ্ধ ঘোষণার মত।

দেখতে দেখতে আরো কিছুদিন কাটল। রোজ সকাল-বিকেল-দুপুর, সারাদিনে কতবার যে টাকার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব নেই। কখনও কামেশ্বর আরক্ত চোখে মুখ বুজে শুধু শুনে যায়, কখনও অকথ্য খিস্তি করে।

সমস্ত ব্যাপারটা কোন মারাত্মক পরিণতিতে পেঁছুত বলা যায় না। হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল ছিবলি। কেউ ডাক্তার ডাকল না, কবিরাজ ডাকল না, এমন কি সামান্য খোঁজটুকু পর্যন্ত করল না। বিনা ওষুধে বিনা শুশ্রূষায় রোগের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে জীবনশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল তার।

অসুখের ধর্মই এই, হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কেও সে দুর্বল করে ফেলে। রাগ-দুঃখ-অভিমান-ক্ষোভ—জগতের সব কিছু একাকার হয়ে ছিবলির ওপর ভর করে বসল যেন। সে ভাবল, পৃথিবীতে তার কেউ নেই। তার এই দুঃসময়ে পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে না। কামেশ্বর টাকা তো দেবেই না; কাছে এসে কপালে একটি

হাতও যদি রাখত! কিন্তু তা বোধ হয় হবার নয়। ছিবলি ভাবল, কি হবে এখানে থেকে? নৌটঙ্কী দলের অভিমানী কিন্নরী প্রবল জ্বরের মধ্যেই কারোকে কিছু না বলে একদিন রাত্রে নিঃশব্দে পথে গিয়ে নামল।

হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোনদিকে কতদূর চলে গিয়েছিল, খেয়াল নেই। শরীরের শক্তি ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আসতে আসতে বেহুঁশ হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গেল।

জ্ঞান যখন ফিরল, দেখা গেল, একটা দেহাতী স্টেশনের পরিত্যক্ত জীর্ণ ওয়েটিং রুমে সে শুয়ে আছে। আর পৃথিবীর সবটুকু ব্যাকুলতা দু চোখে ফুটিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ফুলনরাম। সেই ফুলনরাম, যার চোখ দুটি কৈশোরের শুরু থেকে প্রৌঢ়ত্বের এই সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ত তার পিছু পিছু ছুটেছে।

ভাবনাটা এই মুহূর্তে খুব পরিচ্ছন্ন নয় ছিবলির। নৌটঙ্কীর দলে কদিন সে জ্বরে ভুগছিল—মাত্র এটুকুই মনে আছে। তারপর কিভাবে এই ওয়েটিং রুমে ফুলনরামের ব্যাকুল দৃষ্টির নীচে এসেছে সে বলতে পারবে না। নৌটঙ্কীর দল আর ওয়েটিং রুম—এই দুয়ের মাঝখানে যে ফাঁকটা তা কিছুতেই পূরণ করে নেওয়া যাচ্ছে না।

দুর্বল নির্জীব সুরে ছিবলি বলল, 'আমি এখানে কেমন করে এলাম?'

ফুলনরাম বলল, 'বুখারে তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে, নৌটঙ্কীর ওরা সেই অবস্থায় তোমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গেছে। আমি তোমাকে কুড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।' একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'তোমাকে ওরা আর চায় না। তাই তোমার পাশে এসে দাঁড়ালাম। গুসা হও নি তো?'

জীবনে এই প্রথম কথা বলেছে ফুলনরাম। সবাই যখন

প্রয়োজনের শেষে তাকে ধুলোয় ছুঁড়ে দিয়েছে সেই সময় তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ফুলনরাম। সারাটা জীবন এইজন্যেই কি তার পিছু পিছু ঘুরেছে লোকটা!

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল ছিবলি। কিন্তু বুকের অতল থেকে ঢেউএর মত কি যেন উঠে এসে স্বরটাকে রুদ্ধ করে দিল।

—শেষ—